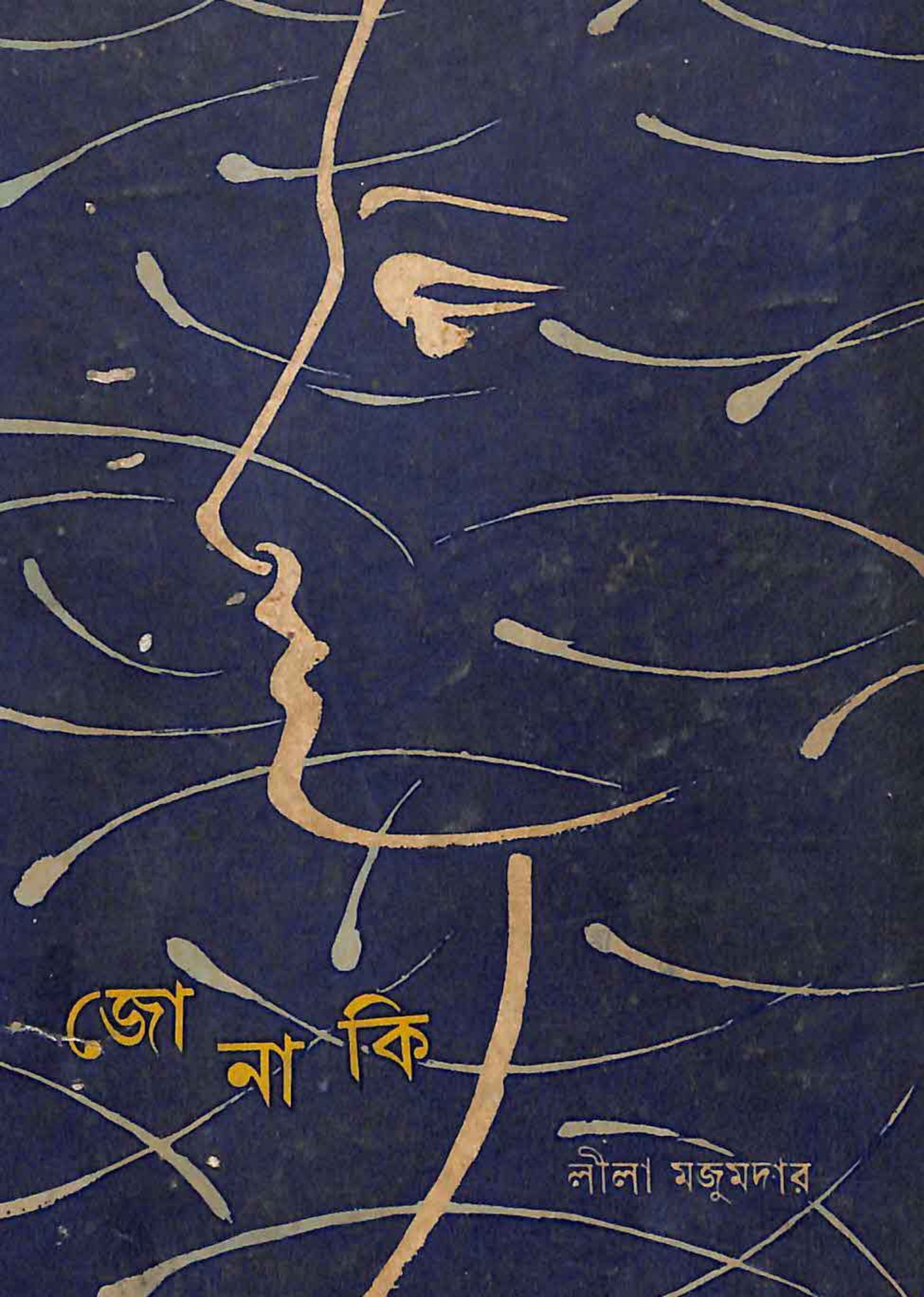
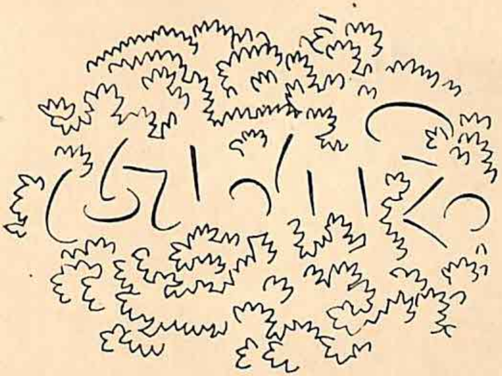

জো না কি
লীলা মজুমদার

চোরাবালি

লীলা মজুমদার



সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২০

আমার মা

সুরমা রায়ের

স্মৃতিতে

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ ১৩৬২

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০/২ এলগিন রোড

কলকাতা ২০

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

মুদ্রক

প্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ

৫ চিন্তামণি দাস লেন

প্রচ্ছদপট মুদ্রক

গসেন এণ্ড কোম্পানি

৭/১ গ্রাণ্ট লেন

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

৬১/১ মির্জাপুর স্ট্রিট

দাম দুটাকা চারআনা

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

যখন দেয়াল-ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল মন্দিরা সেলাই থেকে মুখ তুলে জিগগেস করল, "চা ভিজিয়ে দিই মাসিমা?"

জানলার কাছ থেকে অসহিষ্ণুভাবে হেমনলিনী দেবী বললেন, "কি বুদ্ধি বাপু তোমার! সে এখনো এল না, আর তুমি চা ভেজাবার কথা বলছ!"

মন্দিরা আবার সেলাইয়ে মনোনিবেশ করল।

যখন দেয়াল-ঘড়িতে পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট হল হেমনলিনী দেবী হতাশকণ্ঠে বললেন, "না বাপু, সে আর আজ আসবে না, এত সব খাবার করাই বৃথা হল।"

মন্দিরা আবার মুখ তুলে বললে, "তবে চা ভিজিয়ে দিই?"

মাসিমা বিরক্ত হয়ে বললেন, "একটুও কি তর সয় না, মন্দিরা? সে বেচারী মোটরে চেপে আসবে না, রথে চড়ে আসবে না, পায়ে হেঁটে আসবে। তার পঞ্চাশটি চাকর-দাসী নেই, বাড়ি গুছিয়ে তালা দিয়ে তবে আসবে। কত কারণে মানুষের দেরি হয়, কোথায় একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকবে, না কখন থেকে শুরু করেছ, চা ভেজাই, চা ভেজাই!"

সুদীর্ঘ অভ্যাসের ফলে মন্দিরা এর কোনো প্রত্যুত্তর দিল না। নীরবে আরও পাঁচ-সাত ইঞ্চি সেলাই করে ফেলল। মাসিমা জানলার পর্দাগুলি টেনে সোজা করলেন, টেবিলের উপর থেকে রুমাল দিয়ে অদৃশ্য ধূলিকণা ঝেড়ে ফেললেন, ফুলদানিটি আর একটু ডানদিকে সরিয়ে দিলেন, পুরোনো রুপোর ফ্রেমে আটকানো কবেকার সব ফোটোগুলিকে আবার ভালো করে গুছিয়ে রাখলেন। তারপর জানলার কাছে

টানা চায়ের টেবিলের সরঞ্জামগুলিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

"আবার সেই শশার স্যাণ্ডউইচ, ডিমের স্যাণ্ডউইচ! কেকটাও তোমার আজ যেন একটু শুকনো দেখাচ্ছে, হয় মাখন কম দিয়েছ, নয়তো বেশি বেক করেছ। কই বলেছিলে যে আলু কপি মটর নারকেল দিয়ে সিঙাড়া করবে?"

মন্দিরা এতক্ষণে উত্তর দিলে, "সিঙাড়া ওঘরে একেবারে গড়ে রেখেছি, মিস লাহিড়ী এলেই গরম-গরম ভেজে দেব মনে করেছি।"

মাসিমা তবু খুশি হন না। সামনের চেয়ারটিতে বসে পড়ে খুঁত-খুঁত করতে থাকেন। "মণিকা এলে পর আবার রান্নাঘরে যাবে মন্দিরা? সে কি ভাববে বল তো, আর খনার মা এল নাই বা কেন? গজেনকেই না হয় আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি। তাতে খনার মা'র কী এসে যায়?"

মন্দিরা বললে, "সে বলেছে তার গায়ে হাতে পায়ে বেদনা, একা অত কাজ পেরে উঠবে না।"

মাসিমা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, "বাস্, তুমি তাকে অমনি ছেড়ে দিলে? কী এমন বেশি কাজ শুনি? আমার বাবা বলতেন বিলেতে স্বচ্ছল অবস্থার লোকেও একটিমাত্র ঝি রাখে, সেই সমস্ত কাজ করে। এরা সব নিজেদের কী ভাবে বলতো?"

মন্দিরা এবার সেলাই নামিয়ে পরিপাটি করে ভাঁজ করে নিচু ছোট বইয়ের আলমারির উপর তুলে রাখল। উঠে দাঁড়িয়ে তর্কের সুরে বললে, "সেখানে মাসিমা একজন লোকে সব কাজ করে বটে, তেমনি তাকে অনেক মাইনেও দিতে হয়, ভালো ঘর দিতে হয়, ছুটি দিতে হয়। খনার মাকে তুমি দুবেলা খেতে দাও আর পনেরো টাকা মাইনে দাও—কাজেই তার আগ্রহ কম।"

"তুমি বাপু ওদের বাড় বাড়িয়ে দিয়ো না, মন্দিরা। কিসে আর কিসে, সোনায় আর সীসে!"

বৈকালিক চা না পাওয়াতে দুটি মহিলারই মন অস্থির হয়ে উঠেছে। এমন সময় বাইরে পায়ের আওয়াজ হল এবং তারপরই কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

মাসিমা মন্দিরাকে রান্নাঘরের দিকে ইঙ্গিত করে, দরজা খুলে দেন। মিস মণিকা লাহিড়ী উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করেন।

"সরি হেমনলিনী, এর আগে আর আসবার যো ছিল না।" হ্যান্ড-ব্যাগ নামিয়ে ক্লান্তভাবে সোফায় বসে বলেন, "দিনে-দিনে পৃথিবীটার কী হচ্ছে বল তো? ভদ্রতা, শীলতা, ডিসেন্সি সব বিদায় নিচ্ছে। মন্দিরা কোথায়?"

হেমনলিনী দেবী পাশে বসে বলেন, "আমার রাঁধবার লোকের অসুখ করেছে বলে তোমার জন্য গরম সিঙাড়া ভাজছে। ব্যাপারটা কী বল দেখিনি।"

মিস লাহিড়ী সিঙাড়ার কথা শুনে প্রসন্ন হয়ে বললেন, "বলব আবার কী, যতসব পুরুষমানুষদের কাণ্ড!"

মাসিমা বিস্মিত হন, অনূঢ়া মিস লাহিড়ীর জীবনে পুরুষ-মানুষদের আসনী কোথায় সহসা ঠাহর করতে পারেন না, তবে নিজের সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এবং সুদূর যৌবনে নিজের মায়ের শত-শত সতর্কবাণী থেকে বহুদিন হল এইটুকু শিক্ষা লাভ করেছেন যে পুরুষমানুষরা পারে না এমন কাজ নেই। দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধোলেন, "কেন, কী হল?"

মিস লাহিড়ী সোফার নরম গদির উপর অতি কষ্টে সোজা হয়ে বসে হেমনলিনী দেবীর দিকে মুখ করে বললেন, "তুমি আমি মরে যাব হেমনলিনী, আমাদের জীবন প্রায় শেষ হয়েছে, কিন্তু মন্দিরাকে সাবধান করে দাও। এখানে তোমার ডানার আড়ালে নিশ্চিন্তে বাস করে, ভালো থাকা যে আজকাল কত কঠিন তা হয়তো সে কল্পনাই করতে পারে না। ওকে সতর্ক করে দাও, ভালোর দিকে মন ঘুরিয়ে দাও,

চোখে-চোখে রাখো, নইলে ওর কপালে নিদারুণ দুঃখ আছে এ আমি বলে দিলাম।"

মন্দিরার নিন্দে করলে তার ছায়া গিয়ে হেমনলিনী দেবীর গায়ে লাগে—আজ সাত বছর তাঁর নিত্যসঙ্গিনী সে।

"খেপে গেলে নাকি মণিকা? মন্দিরার অনেক দোষ আছে কিন্তু তার চরিত্র খুব ভালো, তুমি বাপু কী বলতে চাও স্পষ্ট বল, আমি অত হেঁয়ালি বুঝি না।"

"হেঁয়ালি নয় বন্ধু, তার চেয়ে ঢের গুরুতর কথা। তবে মন্দিরার নিন্দে তো করিনি, তাকে সাবধান করে দিতে বলছিলাম।"

"কী বিষয়ে তাকে সাবধান করব বুঝলাম না।"

"ব্রজসুন্দরের বিষয়ে।"

"ব্রজসুন্দর? কে ব্রজসুন্দর? ব্রজসুন্দর বলে কাউকে চিনি না।"

"সেই তো হল কথা। তুমি তাকে চেনো না, দেখনি। আমি দেখেছি, চিনি না। কিন্তু মন্দিরা তাকে দেখেছেও, চেনেও। সে যে কত বড় একটা পামর, আমি অল্প কথায় বোঝাতে পারছি না। নাম বোধহয় শুনেছ?"

রুদ্ধ আবেগে হেমনলিনী দেবীর পেটের কাছে একটা ব্যথা ধরেছিল, মন্দিরার আস্পর্ধা তো কম নয়, লোকের আলোচনার পাত্রী হয় সে! শুষ্ককণ্ঠে বললেন, "না বাপু, নামও শুনিনি! মন্দিরাই বা তাকে চিনল কী করে?"

"তাকেই জিগগেস করে দেখ, তবে আমার সামনে নয়, আমি চলে গেলে ভালো করে বুঝিয়ে বল তাকে। ব্রজসুন্দরের নাম শোননি মানে? আমাদের বাড়ি এত যাওয়া-আসা করে আমাদের পাশের বাড়ির গেটের উপর পেতলের নাম-প্লেটে দেখনি কখনো ব্রজসুন্দর মুখার্জি এম. এ., বি. এল? আরে তার বড় বোন নয়নতারা যে আমার বিশেষ বন্ধু। তার কাছেই তো সব শুনলাম, কাজেই এর মধ্যে আর মিথ্যে কথা কিছু

থাকতে পারে না। বেচারী নয়নতারা, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে একটি ছেলে, দুটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে সেই নাগাদ ভাইয়ের আশ্রয়ে বাস করছে, এখন বোধহয় সে আশ্রয়টুকুও উঠল!"

হেমনলিনী দেবী রান্নাঘরের দরজার দিকে একটা চোখ রেখে, অপর চোখ দিয়ে মিস লাহিড়ীর মুখ দেখতে চেষ্টা করলেন। চাপাগলায় বললেন, "ব্যাপার কী, কিছুই তো বুঝলাম না। ব্রজসুন্দরের বয়েস কত? বিয়ে হয়নি?"

"ব্রজসুন্দরের বয়েস কত হবে? পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ তো মনে হয়। নয়নতারার চেয়ে অনেক ছোট, যদিও কালকের ব্যবহার দেখে আর তা মনে হচ্ছিল না। বিয়ে হয়নি আর কী করে বলি। অবস্থাপন্ন হিন্দু-ঘরের ছেলে, বাইশ বছর বয়সে বাপ-মা বেশ ফরসা সুন্দর দেখে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন, বছর না ঘুরতেই সে বউ স্বর্গে গেল, কাজেই ব্রজসুন্দরকে বিবাহিতই বা কী করে বলি। তবে জেনে রেখ হেমনলিনী, এই রকম পুরুষমানুষরাই সব থেকে ডেঞ্জারাস হয়।"

হেমনলিনী দেবী অসতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন, এর মধ্যে মন্দিরা কখন এক হাতে গরম সিঙাড়ার প্লেট, অপর হাতে গরম জলের কেটলি নিয়ে এসে চায়ের টেবিলের আড়ালে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ্যই করেননি। এবার মন্দিরা অতিশয় বিস্মিত হয়ে বললে, "কে ডেঞ্জারাস পুরুষমানুষ মণিকা-মাসিমা? ভয়ে যে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!"

চারটি প্রৌঢ় চোখের বিষণ্ণ দৃষ্টি দেখে মন্দিরা বলে, "কিছু হয়েছে নাকি মাসিমা?"

হেমনলিনী দেবী দেখলেন জানলা থেকে সূর্যাস্তের রশ্মিরেখা এসে মন্দিরার মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করেছে, তার ঈষৎ লালচে চুলে আরও ঘোর লালের ছোপ ধরিয়ে দিয়েছে, ঠোঁটের কোণে একটুখানি যেন তিক্ততা, চোখে একটুখানি তীক্ষ্ণতা, গণ্ডের কোমলতায় যেন একটুখানি কাঠিন্য, তাঁর বাধ্য মন্দিরার অন্তরে যেন একটুখানি ঔদ্ধত্য।

হেমনলিনী দেবী শঙ্কিত হলেন। মিস লাহিড়ী দেখলেন মুখে পড়ন্ত সূর্যের রোদ লেগেছে মন্দিরার, বয়েস তার সাতাশ-আটাশ, কোমল মুখাবয়বে সুস্পষ্ট অপ্রসন্নতা প্রকাশ পাচ্ছে। হেমনলিনী যদি সময় থাকতে সাবধান না হয় তবে আর কে কী করতে পারে?

মন্দিরার প্রশ্নের কেউই উত্তর দিল না দেখে মন্দিরা নীরবে চা পরিবেশন করতে লাগল। হেমনলিনী দেবী আর মিস লাহিড়ী টেবিলের কাছে এসে বসলেন। সূর্যের শেষ আলোও মিলিয়ে গেল, ঠান্ডা নামল, মন্দিরা জানলা বন্ধ করে আলো জেবলে দিল। এত দেরি করে এ বাড়িতে কখনো চা হয় না, আজ একটা ব্যতিক্রম হয়েছে।

মন্দিরার মনে হল আজ দিনটাই হয়তো একটু অন্য রকম। শনিবার কখনো সপ্তাহের বাকি ছ'টা দিনের মতো হয় না। শনিবারের মধ্যে কাব্য আছে, রোমান্স আছে, আশা আছে, দুরাশা আছে। সকালে মনে হয় বিকেল আসছে অজানার ইঙ্গিত নিয়ে; বিকেলে মনে হয় রাত্রি আসছে অপরূপের বাহন হয়ে।

কেউ আসে না, কিছু হয় না, এমনি করে বছরের বায়ান্নটা শনিবার অস্ত যায়, কিন্তু পরের বছরের বায়ান্নটা শনিবার ভবিষ্যের কুহেলিকা থেকে ধীরে-ধীরে কায়া নেবে। অপরূপ আছেই নাগালের মধ্যে। "শনিবারের চায়ের টেবিলে কেন আনন্দ কোলাহল শোনা যাচ্ছে না, মাসিমা?" হেসে বলে মন্দিরা। "জানেন মণিকা-মাসিমা আজ আপিসে আমার পাঁচ বছর কাজ পূর্ণ হল। এক রকমের জন্মদিন আজ আমার। আমাদের বড় কর্তা আমার মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন আজ। কাউকে খুশি করতে পারলে এমন খুশি লাগে কেন বলুন তো?"

মিস লাহিড়ী বিরস কণ্ঠে বললেন, "তা লাগে বোধহয়। আচ্ছা মন্দিরা, এখানে একটু বস তো। তোমার চা কোথায়?"

মন্দিরা চা নিয়ে কাছে বসে বললে, "কী হল, মণিকা-মাসিমা?"

হেমনলিনী দেবী বললেন, "সে-সব কথা দিয়ে তোমার আর কী

হবে মন্দিরা। বেশ সিঙাড়া করেছ। খনার মা'র অসুখ করেছে বলে একদিক দিয়ে ভালোই হল।"

মন্দিরা অবাক হয়ে একবার মিস লাহিড়ীর দিকে একবার মাসিমার দিকে তাকায়। মিস লাহিড়ী কথা বলতে উদ্যত হতেই মাসিমা বললেন, "ও ছেলেমানুষ, ওর সামনে নাই বা বললে।"

মন্দিরার মনে আজকাল একটা অসহিষ্ণুতা এসেছে। চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে সে বললে, "কোনো ভয় নেই মাসিমা, আমি এখুনি রান্না-ঘরে যাচ্ছি চায়ের বাসন নিয়ে; মণিকা-মাসিমা ততক্ষণ একটু কষ্ট করে চুপ করে থাকবেন। তোমাদের লোমহর্ষক কথা শুনবার আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আর আমি বহুদিন কৈশোর অতিক্রম করে এসেছি, যৌবনও গেল বলে। আমার নৈতিক অবনতি আর কি সহজে হবে!"

রাগ করে মন্দিরা রান্নাঘরের কলের কাছে প্যাকিং কেসের তক্তা দিয়ে তৈরি কাঠের টেবিলের উপর চায়ের বাসন নামিয়ে রাখে। কল খুলে ছোট গামলা করে জল ভরে। গামলা ভরা জল টেবিলের উপর রাখে। তাকের উপর থেকে ছোট টুকরো সাবান খুঁজে বের করে নিপুণ হাতে, নিখুঁতভাবে বাসনগুলি ধুয়ে মুছে বাসনের তাকের উপর তুলে রাখে। টেবিলটাও মুছে ফেলে, হাত ধুয়ে ফেলে। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বাড়ির পিছনে বাগানের ফালির দিকে চেয়ে থাকে।

এ বাগানে সাত বছর ধরে একটি দুটি করে মন্দিরা গাছ লাগিয়েছে। কত রকমের গাছ, হাস্নাহানা, বেলফুল, ম্যাগনোলিয়া, রঙ্গন, চাঁপা, বকুল। কেবল কোণ ঘেঁষে যে কৃষ্ণচূড়ার গাছ, সেটা আগে থেকেই ঐখানে ছিল। যখন সময় হয় ফুলের সম্ভারে সে বাগান আলো করে থাকে, মন্দিরার কষ্ট করে সংগ্রহ করা নিজের হাতে লাগানো ফুলগাছগুলির দিকে তখন আর কারো চোখ পড়ে না।

মন্দিরা ভাবে ওরা কেন আজ অত বিব্রত? ভয়ভাবনা করা মাসিমার জীবনে একটা বিলাসের মতো। ভেবে হাসি পায়—মাসিমার পাখনার

তলায় দীর্ঘ সাতবছর কাটিয়ে প্রায় আধবুড়ো হতে চলল আর মাসিমা ভাবেন সে এখনো সেই নাবালিকাই আছে।

সাতবছর আগের কথা স্মৃতিপথে এসে পড়ে। তরুণী মন্দিরা, কুড়ি বছর তার বয়েস, বি. এ. পাশ করেছে আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই হৃদয়ও ভেঙে গেছে। পাটনা থেকে মা-বাবা পাঠিয়ে দিলেন অবস্থাপন্ন বিধবা মাসির কাছে, যুগপৎ তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গদান ও নিজের ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগাবার জন্য।

মন্দিরা সেই অবধি মাসির কাছে থেকে গেছে, ছুটিছাটাতে বাড়ি যায়। এখানে এসে স্টেনোগ্রাফি শিখে সরকারী আপিসে চাকরি পেল, সেও আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল। এর মধ্যে কখন তার ভাঙা হৃদয় জোড়া লেগে গেছে মন্দিরা লক্ষ্যও করেনি। স্মৃতিপট থেকে কোন অবকাশে বিশ্বাসঘাতক শঙ্করের সুশ্রী মুখচ্ছবি বেমালুম লুপ্ত হয়ে গেছে, মন্দিরা সেজন্য একটু বিলাপও করেনি। প্রেম একটা ব্যাধি, তার হাত থেকে মন্দিরা চিরদিনের মতো নিষ্কৃতি পেয়েছে। সে কি কম সৌভাগ্যের কথা! কিন্তু হায়, যৌবনও যে চলে যায়। শুধু প্রতিদিনকার আপিস যাওয়া-আসা দিয়ে, শুধু প্রশংসাপত্র, মাইনে বাড়া দিয়ে মন ভরে রাখতে গিয়ে যৌবন না শেষে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

ছোট বাগানে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, দোতলায় মাসিমার নতুন ভাড়াটেরা বোধহয় এখনো গুছিয়ে বসতে পারেনি, সেখান থেকে মৃদু টানা-হ্যাঁচড়ার আওয়াজ আসে। ওদের সম্বন্ধেও মাসিমা মন্দিরাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ভালো ব্যবহার কোরো মন্দিরা, প্রয়োজন হলেই সাহায্য করতে দ্বিধা কোরো না। কিন্তু বেশি মেলামেশা কোরো না, ঘনিষ্ঠতা জিনিসটা ভালো নয়, তফাত থেকেই বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রেখ।

মাসিমার জীবনে সম্বন্ধগুলি সব বেশ ক্ল্যাসিফাই করা, লেবেল লাগানো। মাসিমার শ্বশুরবাড়ির ভালো লোকেরা, শ্বশুরবাড়ির মন্দ লোকেরা, বাপেরবাড়ির ভালো লোকেরা আর মন্দ লোকেরা। নিজের

বন্ধুরা, স্বামীর বহুদিনকার পুরোনো বন্ধুবান্ধবরা, পাড়া-প্রতিবেশীরা, যাদের সঙ্গে কাজকর্মের সম্পর্ক তারা, বৈবাহিক সম্পর্কীয়রা। এছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ মাসিমা স্বীকার করেন না। এদের শ্রেণী বিভাগ করা আছে, কোনো গোলমাল হবার আশঙ্কা নেই; একসঙ্গে এদের বড় একটা নিমন্ত্রণাদিও করা হয় না, কাজেই পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার সুযোগও কম। পরস্পরের মধ্যে কেউ অযথা কৌতূহল প্রকাশ করলে মাসিমা তখনই তাকে দমন করেন। এমনি করে বিরাট একটা সুশৃঙ্খলার মধ্যে মাসিমার বিবাহের পর থেকে প্রায় চল্লিশ বছর কেটে গেছে। মন্দিরার কিবা সাধ্য যে এর কোনো রকম একটা ব্যতিক্রম ঘটায়। তবুও মনে হল আজকের দিনটা একটু স্বতন্ত্র।

মন্দিরা ঘর থেকে চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই মিস লাহিড়ী বললেন, "মন্দিরা কত বদলে গেছে। কুসঙ্গে মানুষের এইরকম অবনতি হয়। আগে মিছিমিছি এত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।"

হেমনলিনী দেবী বললেন, "বয়েসও তো হচ্ছে মণিকা, সেটা ভুলে গেলে চলবে কেন? ওর বয়সে আমার আট বছর হল বিয়ে হয়ে গেছে। শাশুড়ি মারা গেছেন, বাড়ির গিন্নি হয়েছি, স্বাধীনভাবে যা খুশি করেছি, ওর মেসোমশাইও আমার কথার উপর কখনো কিছু বলেননি। আর তুমিও তো বাইশ বছর বয়েস থেকে নিজেই নিজের কর্ত্রী হয়েছ। ও প্রসঙ্গ রেখে এখন ব্রজসুন্দরের কথাটা খুলে বল। তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে, এখন আবার মন্দিরার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার মতো মনের অবস্থা নয় আমার।"

"আজ না হয়, কাল বোলো। ঐ ব্রজসুন্দরকে আমি আজ পনেরো বছর ধরে দেখছি, এবাড়ি ভাড়া নিয়েই ওদের নাম-প্লেট আমার চোখে পড়েছিল। কিন্তু ও যে ভিতরে কত বড় শয়তান সেকথা মোটে আজ শুনলাম। আর তা ওর নিজের মায়ের পেটের বড় বোনের মুখেই শুনলাম।"

তারপর মিস লাহিড়ী পাষণ্ড ব্রজসুন্দরের কাহিনী আগাগোড়া হেমনলিনী দেবীকে বললেন। হেমনলিনী দেবীর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, কী সর্বনাশ! এসব লোককে স্বাধীনতা দিলে যে ভদ্রসমাজকে তচনচ করে দেবে। যারা দুষ্টলোক, সমাজত্যাগী, তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎই হয় না, তাদের আবার ভয় করা কেন? কিন্তু যারা ভালোমানুষ, লোকসমাজে বিচরণ করে, তাদের ঠেকানো যায় কী করে। কী হবে? মন্দিরা যদি কথা না শোনে?

কিন্তু আসল ব্যাপারটি নয়নতারা যথাযথভাবে নিবেদন করতে পারেননি। পূর্বদিনের ঘটনাবলীর মোটামুটি বিবরণ দিলেও, তার প্রকৃত মর্ম নয়নতারার বোধগম্য হয়নি।

নয়নতারার বয়েস আটচল্লিশ বছর, গৌরবর্ণা, স্থূলাঙ্গিনী, মুখরা। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিধবা হওয়ার শক্ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বিধবা হয়ে নয়নতারা অথৈ জলে পড়েননি, পাড়াগেঁয়ে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে সদ্য বিপত্নীক ভাইয়ের বাড়িতে উঠে তার গৃহস্থালীর সমগ্র ভার গ্রহণ করলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর কুড়ি বছরের একটি পুত্র, পনরো বছরের একটি কন্যা ও পাঁচ বছরের আরেকটি কন্যা। কালক্রমে ব্রজসুন্দরের সাহায্যে পুত্রের বিদেশে চাকরি, পুত্রের বিবাহ ও একটি কন্যার বিবাহ দিয়েছেন। এখন ছোট মেয়েটিরও আর বিয়ে না দিলেই নয়, এই সময় সহসা শান্তশিষ্ট ব্রজসুন্দর এমন এক কাণ্ড করে বসল যে এখন মেয়ের বিয়ে হয় কিনা সন্দেহ। ব্রজসুন্দর মনে ভাবে কী? নয়নতারা তার চেয়ে তেরো বছরের বড়; ব্রজসুন্দর যখন আঁতুড়ঘরে, তার আগেই নয়নতারা শ্বশুরবাড়ি গেছেন; নয়নতারার ছেলে অবনীর চেয়ে ব্রজসুন্দর মাত্র তিন বছরের বড়। না হয় বাপের সম্পত্তিই পেয়েছে ব্রজসুন্দর; এবারকার ঐ যে নতুন আইনের কথা হচ্ছে ওটা যদি পনরো বছর আগে পাশ হয়ে যেত, তবে ব্রজসুন্দরকে দেখে নিতেন নয়নতারা। ব্রজসুন্দর বুঝি ভেবেছে

বিধবা দিদিকে আশ্রয় দিয়েছে বলে তাঁকে কিনে নিয়েছে একেবারে, এখন বুঝি তার কথায় দিদিকে ওঠ-বোস করতে হবে। ধর্ম কিছু নয়, চরিত্র কিছু নয়, যা খুশি করবে সে, আর নয়নতারা সব সহ্য করবেন— প্রাণ থাকতে নয়। তার চেয়ে মেয়েটার হাত ধরে কাশী চলে যাবেন তিনি; বিশ্বনাথের দোরগোড়ায় পড়ে থাকবেন; অবনীকে লিখবেন : বাবা অবনী, তোমার বুড়ো মাকে আর কচি বোনকে পাষণ্ড ব্রজসুন্দর তাড়িয়ে দিয়েছে, তুমি যদি মাসে-মাসে টাকা না দাও তো এইখানে না খেয়ে মরব! না, তা হবে না। অবনীর দজ্জাল বউ তা হতে দেবে না। অবনী হয়তো লুকিয়ে একবার দশটা টাকা পাঠিয়ে দেবে। নরম করে একখানা পোস্টকার্ড লিখবে, মাসে-মাসে কখনো পাঠাবে না। আর পাঠাবেই বা কেন? কে আছে ব্রজসুন্দরের বাপের সম্পত্তি ভোগ করবার? ব্রজ-সুন্দরের বউ নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, কেন দেবে না সে নয়নতারার খরচ, তাঁর মেয়ের বিয়ের খরচ? অবিশ্যি বলেনি সে কিছুই; কিন্তু মামা এমনধারা উচাটন ব্যবহার করলে মণিমালার কখনোই বিয়ে হবে না, এবং নয়নতারাকেও কাশী চলে যেতে হবে। তখন কী হবে?

নয়নতারা কল্পনানেত্রে স্পষ্ট দেখতে পেলেন বাপ-মরা মেয়ে মণিমালার হাত ধরে, একাকিনী, পদব্রজে প্রায় সাড়ে-চারশো মাইল হেঁটে তিনি কাশী যাচ্ছেন; একথা ভেবে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। মণিমালা ব্যস্ত হয়ে পাশের বাড়ি থেকে মা'র বন্ধু মিস লাহিড়ীকে ডেকে আনলে। বাড়িতে চাকর-বাকর ছাড়া আর কেউ নেই, ব্রজসুন্দর রাগ করে সেই যে সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে এখন অবধি তার দেখা নেই। তবে তার ঘরে টেলিফোনে আহূত প্রৌঢ়া নার্স খুকিটিকে কোলে নিয়ে বসে আছে।

মিস লাহিড়ী প্রতি শনিবারের অভ্যাস মতো হেমনলিনী দেবীর সঙ্গে চা খেতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, হেনকালে তন্বী সপ্তদশী মণিমালা বিস্রস্ত বেশবাসে, দরজায় টোকা না দিয়েই ভিতরে প্রবেশ

করলে। অপ্রসন্ন মুখে মিস লাহিড়ী পাউডার পাফ নামিয়ে রেখে ঘুরে বসলেন। মণিমালার উদভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে তাঁর করুণা হল।

"কী হল মণিমালা?"

"মাসিমা, একবার আমাদের বাড়িতে চলুন, মা কেমন করছে।" মিস লাহিড়ী তৎক্ষণাৎ ব্যাগ হাতে করে উঠে পড়লেন।

"মা'র আবার কী হল? তোমার মামা বাড়ি নেই? ডাক্তারকে খবর দিয়েছ?"

"না মাসিমা, অসুখ-বিসুখ নয়, আপনি চলুন তো, মা'র কাছেই সব শুনবেন। আমি তো বাবা ভালো করে কিছু বুঝতেই পারছি না।"

তখন মিস লাহিড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ স্থগিত রেখে নয়নতারার কাছে গিয়ে, বহু কষ্টে তাকে তখনকার মতো শান্ত করে, প্রায় পৌনে-ছ'টার সময় অশান্ত হৃদয় নিয়ে হেমনলিনীর বাড়িতে পেঁছিলেন।

কিন্তু নয়নতারা ব্যাপারটা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। যে ব্রজসুন্দরকে আজ তেরো বছর ধরে নিয়ত চোখে-চোখে রেখেছেন, যার প্রতিটি ছোট পছন্দ-অপছন্দ তাঁর কণ্ঠস্থ, তাঁকে না বলে যে বাড়ির বাইরে কদাচ পদার্পণ করে না, তাঁর পরামর্শে যার দিবানিশি যাপন হয়, যার পড়াশুনো, আপিস আদালত ছাড়া আর সব কিছু নয়নতারার করতলগত, এ ব্রজসুন্দর সে ব্রজসুন্দর নয়! বাদামী রঙের শাল গায়ে, বাদামী জুতো পায়ে দিয়ে এক ব্রজসুন্দর ক্ষান্তমণির ছেলের পৈতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বাড়ি থেকে যাত্রা করেছিল বটে, কিন্তু রাত্রি দশটার পর বাড়ি ফিরে এল সম্পূর্ণ এক অপরিচিত ব্রজসুন্দর!

ক্ষান্তমণির ছেলের পৈতের ভোজ খেয়ে ব্রজসুন্দর এক ঘণ্টাকাল বৈঠকখানাঘরের ফরাসের উপর আরও একশো-দেড়শো শাল-দোশালা-শোভিত অতিথির সঙ্গে ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে বসে লক্ষ্ণৌয়ের দাড়িওয়ালা ওস্তাদের গান নিবিষ্ট মনে শুনেছিল। তারপর অসহ্য বোধ হওয়ায়, বহু বাধা অতিক্রম করে, বাইরে এসে দেখল যে ইতিমধ্যে তার সর্বনাশ

হয়ে গেছে। তার অত আরামের বাদামী পাম্পস্ জোড়া একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে, একজোড়া সুদৃশ্য সবুজ চামড়ার উপর সোনালী কারুকার্য খচিত নাকতোলা চটি সেই জায়গায় শোভা পাচ্ছে।

ব্রজসুন্দর তার সেই অতি আরামের পাম্পস্ জোড়ার বহু অনুসন্ধান করল। মনে হতে লাগল বড় প্রিয় কোনো বন্ধুজনকে যেন হারিয়েছে। অবশেষে নিরাশ হয়ে সেই সুদর্শন চটি জোড়াটাই পরে শীতকালের সেই বর্ষণোন্মুখ নৈশ অন্ধকারে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতে যুগপৎ একটা পরিবর্তন অনুভব করল। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা নিগূঢ় সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে আছে।

ব্রজসুন্দর নিজেই বিস্মিত হয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকাল, অবাক হয়ে দেখল সেই নিকষ কালো রাত্রির মাঝখানেও পাদুকা দুটি থেকে যেন একটা ফিকে সবুজ আভা বিকীর্ণ হচ্ছে। প্রসন্নমনে ব্রজ-সুন্দর ট্রামে উঠল।

ট্রামে উঠেই চোখে পড়ল সেই মেয়েটি, লেডিজ সীটের কোনা ঘেঁষে উদাসদৃষ্টিতে পথের পানে তাকিয়ে রয়েছে। যখনই মেয়েটিকে দেখে ব্রজসুন্দর, তার মন ভালো হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত বহুবার তাকে দেখেছে, চেতলার মোড়ে সে নেমে যায়—নিশ্চয় কোনো আপিসে কি ইস্কুলে চাকরি করে। কিন্তু এত রাত্রে কখনো দেখা হয়নি।

স্থানাভাবে ব্রজসুন্দরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, মেয়েটিকে ভালো করে দেখবার সুযোগও হয়েছিল। কালো বুটি তোলা গলাবন্ধ জামার সঙ্গে কালোপাড় শাদা শাড়ি পরনে, জামার গলায় খুদে একটি কালো ঘুণ্টি লাগানো, আর ঘুণ্টির ঠিক ডান পাশে একটা শিরা ধুক-ধুক করছে। দেখে ব্রজসুন্দরের বড় মায়া হল।

সেকেলে পরিবারের ছেলে ব্রজসুন্দরের, নয়নতারার পোষ মানা ভাই ব্রজসুন্দরের মেয়েটিকে ভালো লাগল। কেমন শান্ত, সংযত, সঙ্কোচবিহীন। কেমন স্বাধীন, সাহসিকা। রাত্তিরবেলা দিব্যি একা

চলেছে। নয়নতারার কথা মনে হল; মণিমালা পাশের বাড়ি বেড়াতে গেলে সঙ্গে চাকর যায়। সহসা মেয়েটি নেমে গেল; গাড়িটাও কেমন যেন শূন্য বোধ হতে লাগল। অকারণ নৈরাশ্যকে রোধ করে ব্রজসুন্দর লক্ষ্য করল মেয়েটি নেমে গেছে বটে, কিন্তু তার লাল ছোট মানিব্যাগটি ভুল করে ফেলে গেছে। হয়তো ব্যাগে রাখতে গিয়ে অসাবধান হয়ে সীটে ফেলে গেছে। মেয়েরা একটু অসাবধান হয়েই থাকে।

ব্রজসুন্দরের কর্তব্যবুদ্ধি বলল : ওটাকে ট্রাম কোম্পানির হারানো জিনিসের আপিসে দিয়ে দাও। সেখানে হয়তো তিনমাস পড়ে থাকবে কিন্তু তোমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না। কিন্তু কর্তব্যবুদ্ধি থেকে প্রবল একটা বুদ্ধি বলল—দিও না, দিও না। ব্যাগের সূত্র অবলম্বন করে কী না হতে পারে?

ব্রজসুন্দর গুরু পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে ব্যাগের উপর চেপে বসল। কেউ লক্ষ্য করল না। বাড়ির কাছে পৌঁছে বাদামী শালের অন্তরালে, অতি গোপনে, ব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়ল।

ইতিমধ্যে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। ব্রজসুন্দর ট্রাম থেকে নেমে একটা গাড়িবারান্দায় আশ্রয় নিল। আশ্রয় নেবামাত্র আর একটি মেয়ে তার চোখে পড়ল।

পরনে তার চুমকি দেওয়া ঘোর নীল রঙের শাড়ি আর অদ্ভুত একটা খাটো মতন নীল মখমলের জামা, গলায় দু-ছড়া মুক্তোর মালা, কপালে লম্বা করে কাজলের টিপ আঁকা, কোঁকড়া চুল কেমন চুড়ো করে বাঁধা, চোখের কোলে গভীর ছায়া, দীর্ঘ পল্লবে নীল রেখা, গোলাপ ফুলের মতো গাল দুটি, প্রবালের মতো ঠোঁট।

চকিতদৃষ্টিতে ব্রজসুন্দর সমস্ত লক্ষ্য করল, আরও বিস্মিত হয়ে দেখল কোলে তার লাল রেশমি জামা গায়ে, দুহাতে সোনার কাঁকন পরা ছোট একটি খুকি।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকাতেই সে এমন বিহ্বল অথচ কাতর

কটাক্ষ করল যে, ব্রজসুন্দর চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হল। মেয়েটি একটু কাছে এসে দাঁড়াল। তার অঙ্গ থেকে রাশি-রাশি গোলাপ, গন্ধরাজের সুবাস আকাশে-বাতাসে ছড়াতে থাকল।

নয়নতারার সুদীর্ঘ শিক্ষার সুযোগ্য ছাত্রের মতো ব্রজসুন্দর গাড়ি-বারান্দার আশ্রয় ত্যাগ করে ভিজে রাস্তায় পদার্পণ করল। মেয়েটিও ত্রস্ত পদক্ষেপে কাছে এসে শঙ্খের ভিতর যে-রকম সাগরের কল্লোল শোনা যায়, তার মতো চাপা গলায় বলল, "যেও না, আমি বিপন্ন।"

বর্ষা নিশীথে নিঃসঙ্গ বিপন্না নারীকে কেমন করে প্রত্যাখ্যান করে ব্রজসুন্দর ?

তখন সেই অপরিচিতা মেয়েটি ব্রজসুন্দরের দিকে কোলের শিশুসহ দুবাহু প্রসারিত করে বলল, "একে পাঁচ মিনিট ধরবে? আমি এখুনি আসছি।"

ব্রজসুন্দর অনভ্যস্ত হাতে শিশুকে গ্রহণ করল। তার মুখখানি বেলফুলের মতো, চোখদুটি পদ্মফুলের মতো, কচি-কচি আঙুল দিয়ে ব্রজসুন্দরের বাদামীশালের কোনা ধরে সে মুখে পুরল। ব্রজসুন্দর শীতের হাওয়া থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য নিজের শালের ভিতরে টেনে নিল। ততক্ষণে সেই অপরিচিতা নিজের নীল শাড়ি দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে।

ব্রজসুন্দর বহুক্ষণ খুকিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাত্রি আরও গভীর হল, পথে লোক চলাচল বিরল হয়ে এল। অবশেষে ব্রজ-সুন্দরের মনে হল যে খুকির মা আর আসবে না। মনে হল খুকিকে থানায় জমা দিয়ে দিই।

খুকি খুদে হাত দিয়ে ব্রজসুন্দরের পাঞ্জাবির পকেট আঁকড়ে রইল, উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে ব্রজসুন্দরের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল।

নয়নতারার মুখশ্রী স্মরণ করে সেই শীতের রাত্রেও ব্রজসুন্দর

ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পুরুষসিংহের ভয় করা সাজে না, তাই অচেনা এক ব্যক্তির জরিদার সবুজ চটি পায়ে দিয়ে, অজানা এক মেয়ের টাকাভরা লাল মানিব্যাগ পকেটে নিয়ে, অপরিচিতা এক নারীর লাল জামা-পরা খুকিকে কোলে করে রাত্রি দশটার সময় ব্রজসুন্দর অনিশ্চিত পদক্ষেপে নিজের বাড়ির সদরদরজায় মৃদু-মৃদু করাঘাত করল।

ব্রজসুন্দরের দেরি দেখে নিদারুণ উদ্বেগে উপর-নিচ করে-করে নয়নতারার পা ব্যথা করছিল। উপরন্তু ক্ষান্তমণিকে টেলিফোন করে তিনি জেনেছিলেন যে ব্রজসুন্দর বহুক্ষণ হল বাড়ি যাবার নাম করে বিদায় গ্রহণ করেছে। ব্রজসুন্দরের আক্কেল দেখে দুশ্চিন্তা এবং ক্রোধে নয়নতারা অস্থির হয়ে উঠেছেন এমন সময়ে ব্রজসুন্দর বাড়ি ফিরে এল।

মনে-মনে ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানিয়ে নয়নতারা নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন, ব্রজসুন্দর ঘরে ঢুকল।

নয়নতারা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। ব্রজসুন্দর দুশ্চিন্তায় কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হয়ে খুকিকে তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, "শিগগির ধর! কেমন যেন ভিজে-ভিজে ঠেকছে।"

এমন কথা কেউ শুনেছে কখনো? শিউরে উঠে নয়নতারা দুই চোখ বুজলেন।

ব্রজসুন্দর উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "কি মুশকিল! এখন চোখ বুজলে চলবে কেন, ধর শিগগির, ধর বলছি।"

নয়নতারা সাত হাত তফাতে দাঁড়িয়ে, চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "তুই কি পাগল হয়েছিস ব্রজসুন্দর? তোর এই ম্লেচ্ছাচারের বাড়িতেও কত না কষ্টে নিজের শুচিতা রক্ষা করে আসছি, আর তুই কোত্থেকে না কোত্থেকে একটা মেয়ে নিয়ে এসে বলছিস, ভিজে-ভিজে ঠেকছে—ধর শিগগির! তুই পাগল হয়ে থাকতে পারিস, আমি তো আর হইনি।" বলতে-বলতে নয়নতারার শিরায়-শিরায় রক্ত গরম হয়ে উঠল। এগিয়ে

এসে ব্রজসুন্দরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আর আমি কি না ভেবে-ভেবে ভয়ে কাঠ হয়ে ঠাকুরকে ডাকছি! বল্ শিগগির, ওটা কার মেয়ে, কোথায় পেলি?"

ব্রজসুন্দর তখন খুকির আর্দ্রতার কথা ভুলে গিয়ে আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী বিবৃত করল, ট্রামের সেই মেয়েটি ও তার মানিব্যাগের কথা অবশ্য গোপন করে।

শুনে নয়নতারার প্রায় বাক্যরোধ হবার উপক্রম হল। তারপর বলে উঠলেন, "এ যে আমি যা মনে করেছিলাম তার চেয়েও খারাপ! দিয়ে আয় বলছি মেয়েটাকে, এই মুহূর্তে দিয়ে আয়!"

ব্রজসুন্দর অবাক হয়ে বললে, "কি জ্বালা : বলছি সে কোথায় যেন চলে গেল, নইলে তো দিয়েই আসতাম! কোন সাহসে বাড়িতে আনি, তোমায় কি আর আমি চিনি না?"

"না, চিনিস না! কোনদিনই বা চিনলি! অকালে অনাথা হয়েছি বলেই না তোর এই ম্লেচ্ছাচারের বাড়িতে কচি মেয়েটাকে নিয়ে পড়ে আছি! নইলে উনি যদি আজ থাকতেন আমাকে কি আর এক দণ্ডও—" আবেগের আধিক্যে নয়নতারা বাক্য অসমাপ্ত রেখে চোখে আঁচল তুললেন।

ব্রজসুন্দর বহুদিন পর সহসা রেগে গেল। গায়ের শাল মাটিতে ফেলে দিয়ে, মাথার পিছনে দণ্ডায়মানা নির্বাক মণিমালার দিকে চেয়ে বললে, "সাড়ে-পাঁচ ফুট লম্বা হল; কচি মেয়ে না হাতি! এই মণিমালা, এক্ষুনি একে ধর বলছি, নইলে ভালো হবে না।"

শান্তশিষ্ট মাতুলের কণ্ঠে হঠাৎ রূঢ় কথা শুনে আদুরে মণিমালা ঘাবড়িয়ে গিয়ে, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে দুই হাত বাড়িয়ে ব্রজসুন্দরের কোল থেকে শিশুকে নিল।

"আহা! কি করিস! কি করিস, মণি, এই শীতের রাত্রে আবার তোকে স্নান করতে হবে না? নামিয়ে দে বলছি!"

ব্রজসুন্দর কিন্তু আর আগের মানুষটি নেই, হঠাৎ যেন বদলিয়ে গেছে। সে অস্ফুট গর্জন করে বলল, "খবরদার মণিমালা, নামালে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। যাও ওকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে, তোয়ালে-টোয়ালে দিয়ে শুকিয়ে, আমার খাটে শুইয়ে, কম্বল চাপা দিয়ে, ঘুম পাড়াও!"

মণিমালা চলে গেলে সদর্পে দিদিকে বললে, "তোমার বেশি ভয়ের কারণ নেই, আমি এক্ষুনি সত্যেন ডাক্তারকে টেলিফোন করে একজন নার্স আনাচ্ছি। তারপর নিষ্পাপ মণিমালাকে গোবর জলের ছড়া দিয়ে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে ঘরে তুলো! ঘণ্টাখানেক ধৈর্য ধরে থাক!"

নয়নতারা এমন কথার কোনো উত্তর দিলেন না দেখে, ব্রজসুন্দর তাঁর মুখের দিকে তাকাল। নয়নতারা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে একদৃষ্টে ব্রজসুন্দরের দুটি পায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ব্রজসুন্দরও সেই দিকে চেয়ে দেখল। সুদৃশ্য সবুজ জুতোজোড়া লাল মেঝের উপর জ্বলজ্বল করছে! আর তারই পাশে মাটির উপর পড়ে আছে ছোট একটি লাল মানিব্যাগ, তার উপর হলদে চামড়ার কারুকার্য করা স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে : 'মন্দিরা'।

মুহূর্তের মধ্যে অবাধ্য রক্তস্রোতে ব্রজসুন্দরের গৌর মুখখানি প্লাবিত হল, কর্ণমূল রক্তিম হয়ে উঠল।

নয়নতারা কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "থাক ব্রজসুন্দর, আর কিছু বলতে হবে না, আমি সব বুঝেছি।"

ব্রজসুন্দর তাঁর কথায় কান না দিয়ে মানিব্যাগটি পুনরুদ্ধার করে ধীরে-ধীরে নিজের ঘরের অভিমুখে রওয়ানা হল।

মনে ভাবল—বেশ নাম মন্দিরা। খাসা নাম।

পথে একবার নার্সের জন্য টেলিফোন করবার উদ্দেশ্যে থামতে হল। সত্যেন ডাক্তার কাউকে কখনো না বলে না। সে প্রতিশ্রুতি দিল ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একজন প্রৌঢ়া নার্স উপস্থিত হবে। সত্যেন

ডাক্তারের সঙ্গে নয়নতারার সুদীর্ঘ পরিচয়, সেইজন্য সে বারবার বললে, "বেশ বয়স্থা নার্স ব্রজসুন্দর বাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

ব্রজসুন্দর দৃপ্তকণ্ঠে বললে, "তরুণী ও সুন্দরী হলেও কিছু এসে যাবে না। যত শিগগির সম্ভব পাঠাবেন তাকে। বুড়ো যে তাকে হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।" মনে-মনে বললে, "দিদি ভারি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। দু-একটা শক্ পেলে ওর ভালো বই মন্দ হবে না।"

ঘরে এসে দেখে মণিমালা আলোয়ান জড়িয়ে খুকিকে কোলে নিয়ে বসেছে, ব্রজসুন্দর কোনো কথা না বলে দেরাজ খুলে লাল মানিব্যাগটি তার মধ্যে পুরে দেরাজ বন্ধ করে চাবি দিল। মণিমালা খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, প্রশ্ন করা সাহসে কুলোল না। সবুজ জুতো পায়ে দিয়ে তার মামাকে যেন কী রকম অন্য ধরনের বোধ হচ্ছে।

তারপর ক্লান্তভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ব্রজসুন্দর বললে, "ঠাকুরকে দিয়ে একটু দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, চামচে করে খাইয়ে দে। ওর খিদে পেয়েছে, না খেলে ঘুমোবে না।" আবার নিচে গিয়ে ব্রজসুন্দর দুধ ফরমায়েস করে, কান খাড়া করে শুনল নয়নতারার বন্ধ দরজার অন্তরাল থেকে ক্ষুব্ধ রোদনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাষ্ঠহাসি হেসে ব্রজসুন্দর মাটি থেকে পরিত্যক্ত বাদামী শালখানি তুলে দেখলে এক প্রান্ত খুকির কৃপায় একেবারে ভিজে। শালখানিকে বসবারঘরের একটা চেয়ারের উপর ফেলে আর একটাতে বসে পড়ে, চারদিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে দেখে নিল কারো সহানুভূতিহীন চোখ তাকে নিরীক্ষণ করছে কিনা। তারপর ইংরিজিতে স্পষ্ট করে বলল, "লাইফ ইজ ওয়ান ড্যাম থিং আফটার অ্যানাদার!"

খানিকক্ষণ পরে নার্স এসে হাজির হল। একেবারে নয়নতারার মনের মতো নার্স, বিগত-যৌবনা, কৃষ্ণকায়া, স্থূলাঙ্গিনী, চোখমুখে সতীত্বের সুস্পষ্ট ছাপ।

ব্রজসুন্দর তাকে অভিবাদন করে, সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা জানিয়ে উপরে নিয়ে গেল। ততক্ষণে মণিমালা খুকিকে দুধ খাওয়ানো শেষ করেছে। খুকি ঘুম-ঘুম চোখে ছোট দুখানি হাত বাড়িয়ে তার নাক ধরতে প্রবল চেষ্টা করছে। মণিমালার মুখে কৌতুকের হাসি।

নার্স খুকির চার্জ নিলে, ব্রজসুন্দর বললে, "খুকিকে নিয়ে আপনি এখানে শোবেন। ওর জিনিসপত্র কিছু নেই, কাল আমাকে একটা ফর্দ করে দেবেন, সব আনিয়ে দেব। আজ ঘুমিয়ে পড়ুন।"

তারপর মণিমালাকে বললে, "এত রাত্রে স্নান করতে যাবার কোনো দরকার নেই। দিদি হয়তো তোকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। তুই যা, অবনী যে ঘরে শুত সেখানে বিছানা কম্বল সবই আছে, পেতে নিয়ে শো গে যা।"

মণিমালা বললে, "আর তুমি?"

ঐ একটুখানি সহানুভূতির স্বর শুনে ব্রজসুন্দর অনেকটা সুস্থ বোধ করল।

"হ্যাঁ, সে একটা কথা বটে! দেখ, বসবার ঘরের ডিভানে শোবার আমার বহুদিনের শখ। তা দিদি কিছুতেই দেবে না। বেশ একটা সুযোগ পাওয়া গেল। তুই অবনীর ঘর থেকেই আমাকেও একটা ফালতু বালিশ আর একটা কম্বল দে তো।"

মণিমালা নিচে গিয়ে মামার বিছানা করে দিয়ে এল, এক গেলাশ জল ঢাকা দিয়ে পাশে টেবিলের উপর রেখে এল। তারপর নয়নতারার দরজায় দু-তিনবার মৃদু টোকা দিয়ে, কোনো উত্তর না পেয়ে, নিশ্চিন্ত মনে অবনীর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

এমনি করে সেই শুক্রবারের রাত্রি কাটল। পরদিন অতি প্রত্যূষে কেঁদে-কেঁদে জবাফুলের মতো চোখ করে, নয়নতারা শয্যা ত্যাগ করলেন। মণিমালার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন না, কারণ গভীর রাত্রে একবার উঠে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে মণিমালার নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার এসে শুয়েছিলেন।

অভ্যাসমতো ঘুম থেকে উঠে কনকনে ঠান্ডা জলে হাত-পা ভালো করে ধুয়ে একখানি শুদ্ধবস্ত্র পরে তার উপরে ছাই রঙের পুরু শাল জড়িয়ে পুজোর পালা সাঙ্গ করলেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে নিচে এসে দেখলেন বসবার ঘরের ডিভানের উপর দিব্যি আরাম করে কম্বল জড়িয়ে ব্রজসুন্দর গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

নয়নতারা অবাক হলেন। গন্ধমাদনের মতো বিরাট পাপের বোঝা মনের উপর চেপে থাকলেও পুরুষমানুষরা কেমন দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে খায়-দায়-ঘুমোয়! নির্দোষ নয়নতারা সারারাত ছটফট করেছেন, আর ব্রজসুন্দর যে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় রাত্রি কাটিয়েছে একথা আর কারো বলে দিতে হবে না।

রান্নাঘরের অন্তরালে গত রাত্রে খাবার সময়ে বামুনঠাকুর অন্যান্য চাকরদের কী বলেছিল না বলেছিল তার কোনো হিসেব নেই। পরদিন যথাসময়ে, গরম চা নিয়ে ব্রজসুন্দরের খাস চাকর সুরেন মনিবের ঘুম ভাঙাল।

ব্রজসুন্দর কম্বল জড়িয়ে চা পান করতে-করতে বললে, "হ্যাঁরে সুরেন, দিদি উঠেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি বলছেন তাঁর শরীর ভালো নেই, দিদিমণি ভাঁড়ার দেবেন, রান্না বলে দেবেন। চাবিগোছা অমনি ঠাকুরের সামনে ফেলে দিয়ে এলেন। কেমন-কেমন যেন রেগে আছেন মনে হল। এই যে আমি চাবিগোছা কুড়িয়ে এনেছি, ঠাকুর-চাকরের কাছে না থাকাই ভালো।"

ব্রজসুন্দর একবার অপাঙ্গে সুরেনের মুখটা দেখে নিয়ে বললে, "কাল রাত্রে যে নার্স এসেছেন, তাঁকেও চা রুটি মাখন দিও, সুরেন।"

ততক্ষণ মণিমালাও উঠে এসেছে, ব্রজসুন্দর তার হাতে চাবি দিয়ে দিল। নার্সের নিশ্চয় গরম জলের প্রয়োজন হবে তা মনে করিয়ে দিল।

মণিমালার মন ভালো নেই। সকাল থেকে নয়নতারা তার সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছেন। মাঝখান থেকে মিছিমিছিই ভোর-বেলা মণিমালা স্নান করে সারা হল!

গৃহস্থালীর দাবি মিটিয়ে মণিমালা মামার ঘরে উঁকি মেরে দেখে এল খুকির ঘুম ভেঙেছে, খাটে শুয়ে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে, কী সুন্দর যে লাগছে! নার্সও হাসিমুখে তাকে অভিবাদন করল। মণিমালার বুকের ব্যথাটা অনেক পরিমাণে লঘু হয়ে গেল।

নার্স মণিমালাকে দশইঞ্চি লম্বা এক ফর্দ দিয়ে বলল, "আপনার মামাকে দেবেন, খুকুমণির জন্যে লাগবে।"

মণিমালা ফর্দ নিয়ে নিচে এসে ব্রজসুন্দরের হাতে দিল। ব্রজসুন্দর বালাপোশ জড়িয়ে মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। ফর্দখানি হাতে নিয়ে সে বলল, "দেখ্ মণিমালা, তোকে সব ভার দিয়ে দিলাম, যা ভালো মনে হবে তাই করবি। তোকে স্বাধীনতা দিলাম, কোনো বিষয়ে মা'র সঙ্গে পরামর্শ করবার দরকার নেই। আর শোন্, আমি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি, এই সব জিনিসপত্র বেলা দশটা, সাড়ে-দশটার মধ্যে পৌঁছুবে, তুই নার্সকে দিয়ে দিস। আমার কাজকর্ম আছে, কখন ফিরব ঠিক নেই।"

কিছুক্ষণ পরে সত্যি-সত্যি ব্রজসুন্দর নিত্যকার অভ্যাসমতো স্নান-খাওয়া সম্পন্ন করে বেরিয়ে গেল। মণিমালা প্রমাদ গণল। তবে কি তাকে

এই সুমধুর স্বাধীনতা একলাই ভোগ করতে হবে? মা যদি মৌন ভঙ্গ করে কিছু বলেন! মণিমালা কী উত্তর দেবে? উদভ্রান্তদৃষ্টিতে মণিমালা জানলা দিয়ে পাশের তিনতলা বাড়ির দিকে তাকাল, একবার মণিকা-মাসিমাকে ডেকে আনলে কেমন হয়? এই নতুন পরিস্থিতি একমাত্র মণিকা-মাসিমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরই উপযুক্ত। খুকিটা কিন্তু ভারি মিষ্টি, ঠোঁটের কোণে কেমন একটি মিস-কালো তিল আছে। মা'র যত ই-য়ে!

খুকির জন্যে সাবান, তেল, পাউডার; ছোট-ছোট জামা, জাঙিয়া, মোজা; সবুজ রঙের কম্বল, অয়েল-ক্লথ, খুদে বালিশ, খুদে তোশক; দুধের বোতল, বোতলের বুরুশ, বোতল রাখবার গামলা, স্নানের গামলা; তোয়ালে, শাল, টিনের দুধ, দু-একটা ওষুধ না কি যেন এল। মণিমালা অবাক! এ কি, মামা কি তবে একে পুষ্যি নেবেন নাকি! তবেই তো হয়েছে, মা আর কাকেও আস্ত রাখবেন না! দাদা থাকলে বেশ হত, দাদা বেশ মামা যা বলেন তাতেই সায় দেয়। তাহলে মাকেও হার মানতে হত। খুকিকে নিয়ে সবাই মিলে বেশ থাকা যেত।

বেলা বাড়তে লাগল। মণিমালা একবার মা'র কাছে গিয়ে সাধ্যসাধনা কান্নাকাটি পর্যন্ত করে এল কিন্তু কোনো লাভ হল না। মৌন ভঙ্গ হল বটে, কিন্তু মা এমন সব শানিত-শানিত বাক্য প্রয়োগ করতে লাগলেন যে মণিমালার মনে হল এর চেয়ে মৌনই ছিল ভালো। নয়নতারা জলস্পর্শ করলেন না।

মণিমালা নার্সকে ডেকে খাওয়াল, নিজে খুকুর কাছে বসল। তারপর নিজে খেয়ে এল। বিকেলে গৃহস্থালীর ব্যবস্থা করে, ভাঁড়ারঘর থেকে বাটি ভরে আচার নিল, হাতে নতুন মাসিক পত্রিকা নিয়ে অবনীর শোবার ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে নীরব আরামে দিন কাটাল।

বিকেলে চারটের সময়ে সুরেনের ডাকাডাকি শুনে বেরিয়ে এল। রান্নাঘরের সামনে আধাবয়সী একজন হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক ছোট একখানি টিনের বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে দ্রুত হিন্দীতে কী যেন নিবেদন করছে।

মণিমালাকে দেখে সে যেন কূল পেল। মণিমালা বিপদে পড়ল, সেই অচেনা স্ত্রীলোকের দীর্ঘ বক্তৃতার কতক-কতক তার বোধগম্য হল বটে, কিন্তু বিশ্বাস হল না। যতদূর মনে হল এ বাড়িতে বাস করাই তার উদ্দেশ্য।

তার উপরে, সম্ভবত গোলযোগ শুনেই নয়নতারাও এসে রুক্ষ কেশে শুষ্ক মুখে নীরবে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

নার্সও নেমে এল। স্ত্রীলোকটি তাকে দেখে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। নার্স বললে এই হল সত্যেন ডাক্তারের প্রেরিত দিনরাতের আয়া। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং হাসপাতালে ট্রেনিং নিয়েছে। নার্স তাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আগামী কাল বিদায় নেবে, এ ধরনের কাজ তার পোষায় না, সে রোগীর সেবা করতে অভ্যস্ত।

আয়াকে নিয়ে নার্স উপরে গেলে, নয়নতারা কঠিন স্বরে ডাকলেন, "মণিমালা।"

"কী মা?"

"এক্ষুনি যা, সামান্য কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নে, আমাদের আর এখানে থাকা পোষাবে না, আমরা কাশী-টাশি কোথাও চলে যাই।"

"কাশীতে কোথায় থাকবে মা? তার চেয়ে দাদার কাছে গেলে হয় না?"

নয়নতারা অসহিষ্ণুভাবে বললেন, "তোমার ঐ গুণের বৌদিদিটিকে দেখেও দাদার বাড়ির কথা বলছ মণিমালা, তোমার আত্মসম্মান কোথায়?"

"আত্মসম্মানের কথা কী করে উঠল মা? বৌদিকে আমার বেশ ভালো লাগে। তুমিই তো ওর পেছনে দিনরাত লেগে-লেগে ওর মেজাজ বিগড়ে দাও।"

"তাই ভালো মণিমালা! তোমার বাবা যেদিন চোখ বুজলেন, সেই-দিনই তোমার হতভাগিনী গরীব বিধবা মায়ের যে সব অবলম্বন খসে পড়ল, এ আমি বেশ জানি।" কপালে করাঘাত করে নয়নতারা উচ্চৈঃস্বরে

কেঁদে উঠলেন, "ওগো তুমি কোথায় গেলে, আমাকেও নিয়ে চল!" মণিমালা আর কালবিলম্ব না করে খালি পায়ে, খোলা চুলে পাশের বাড়ি ছুটে গিয়ে মণিকা-মাসিমাকে ডেকে আনল।

মাকে সেদিনকার মতো ঠাণ্ডা করতে মণিকা-মাসিমার প্রায় দেড়ঘণ্টা সময় কেটে গেল। অতঃপর নয়নতারা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে মণিমালার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে না ভেবেচিন্তে সহসা কোনো বিষয়ে মন স্থির করে ফেলবেন না।

মিস লাহিড়ী অবশেষে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন, আর এতবড় একটা স্বার্থত্যাগ করার ফলে অতিশয় ক্লান্ত বোধ করাতে, এক গেলাস দুধ খেয়ে নয়নতারাও আবার শয্যাগ্রহণ করলেন।

সন্ধ্যা ছ'টার পর মণিমালা ও নার্স দুজনে একসঙ্গে বসে চা পান সমাপন করল। নার্স লোকটি বেশ। মণিমালার সঙ্গে দেখতে-দেখতে দিব্যি তার ভাব হয়ে গেল। সে বললে, "তুমি ম্যাট্রিক পাশ করেছ বলছ, তবে কলেজে পড় না কেন?" মণিমালাকে নীরব দেখে আরও বললে, "ও, বিয়ে ঠিক হয়েছে বুঝি?"

মণিমালা সলজ্জভাবে জানালে যে একেবারে স্থির না হলেও দু-তিন জায়গায় কথাবার্তা হয়েছে। একটা না একটা লেগে যাবে হয়তো।

নার্স বিস্মিত হয়ে বললে, "এরকম বিয়ে তোমার ভালো লাগে? আমার তো ধারণা ছিল আজকালকার মেয়েরা অন্য রকমের হয়, লেখাপড়া শিখে ঘুরে ফিরে বেড়াতে চায়, আলাপ পরিচয় হলে তবে বিয়ে করতে রাজী হয়।" ওরকম হত নার্সের যৌবনকালে, তারও ঐ রকম বিয়েই হয়েছিল। তারপর কুড়িবছর বয়সে বিধবা হয়। শ্বশুরবাড়িতে অভাব অনটন, বাপের অবস্থাও ভালো নয়, কোলে একটি ছোট ছেলে। অগত্যা একরকম বাধ্য হয়ে, মায়ের এক আত্মীয়ার সাহায্যে একটা ভালো

হাসপাতালে ঢুকে ট্রেনিং নিয়ে, পাশ করে, তবে এখন কাজ করছে। বেশ ভালো লাগে এই কাজ। প্রথম-প্রথম ছেলেটার জন্য মনকেমন করত। ছেলেটা তার দিদিমার কাছেই মানুষ হয়েছে, মাকে আর চিনল কোথায়? তবে বেশ ভালোভাবে মানুষ হয়েছে, এখন মোটরের কারখানায় কাজ করে, ভালো মাইনে পায়, বাড়ি ভাড়া করে মাকে নিয়ে থাকে। বিয়ে করেছে, বৌটিও ভালো। তবে পুত্রবধূ কবে খোঁটা দেবে তার অপেক্ষা না রেখে নার্স কাজকর্ম সমানে করে যাচ্ছে। ওর জন্যে ছেলে-বউয়ের যা না খরচ হয়, ও তাদের দেয় তার তিনগুণ।

মণিমালার নার্সকে ভারি ভালো লাগল। নার্সও যদি এখানে বারো-মাস থাকত তাহলে বেশ হত, কিন্তু মাকে নিয়েই যে মুশকিল!

চায়ের পর্ব শেষ হতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আজ শনিবার, মামা কেন এখনো ফিরছেন না? নার্স উপরে চলে গেলে, মণিমালা বসবার-ঘরের টুকিটাকিগুলি গুছিয়ে রেখে, ডিভানের উপর মামার জন্য পরিপাটি করে বিছানা পেতে রাখল।

ভাবলে, বাবা! মা'র কী রাগ! অন্য শনিবার হলে এতক্ষণেও মামা না এলে মা'র বোধ করি হার্টফেলের উপক্রম হত। মামা তো চিরটাকাল মা'র কাছে প্রতিটি মুহূর্তের হিসেব দিয়ে-দিয়েই হয়রান হয়ে গেছেন!

"কোর্ট থেকে বেরুলে সাড়ে-চারটেয়, তবে বাড়ি এলে কেন ছ'টার সময়ে?"

"পথে যে মোজা কেনবার জন্য থামতে হল!"

"দোকান তো তিন ক্রোশ পথ নয়; তবে এতটা দেরি কেন হল?"

"দোকানে বিকাশের সঙ্গে দেখা হল, কথায়-কথায় দেরি হয়ে গেল।".

"তোদের গল্প কি আর শেষ হয় না! কোন বিকাশ?"

"বিকাশ দত্তকে মনে নেই দিদি? সেই যে আমাদের পাশের বাড়ির বিকাশ দত্ত! কতকাল পরে যে দেখা হল। কী মোটাই যে হয়েছে বিকাশ, কে বলবে যে এককালে সে ফড়িংটি ছিল!"

"ওঃ, সেই দুষ্টু বিকাশ। ঐ রকম বদমায়েস ছাড়া আর কার সঙ্গে তোর দেখা হবে বল্! আর আমরা যে বাড়িতে ভেবে মরছি, সেটা বুঝি কিছু নয়?"

"ঐ কথায়-কথায় দেরি হয়ে গেল দিদি। বিকাশ একদিন আসবে বলল।"

"কোথায় আসবে? এ বাড়িতে? আমি বেঁচে থাকতে নয়, কী রকম চোর ছিল ভুলে গেছিস? ওর জ্বালায় আমাদের গাছে একটাও পেয়ারা পাকতে পারত না!"

এই ধরনের কথাবার্তা শুনে-শুনে মণিমালা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। মাঝে-মাঝে মামার জন্য বেশি সহানুভূতি হলে তাকে সমর্থন করতেও মণিমালা পেছপাও হত না।

বেচারা মামাবাবু! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মণিমালা জানলা থেকে সরে এল।

চায়ের নিমন্ত্রণ ফেরত মণিকা-মাসিমা একবার মায়ের খোঁজ নিয়ে গেলেন। নয়নতারা তখন দিবানিদ্রার অনভ্যস্ত আবেগের ফলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মণিকা-মাসিমা মণিমালাকে দু-একটা সতর্কবাণী বলে, নিজের কৌতূহল দমন করতে না পেরে একবার উপরে গিয়ে ঘুমন্ত খুকিকে দেখে এলেন।

বালিশের উপর কোঁকড়া চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছে, মুদিত চোখ-দুটি ফুলের পাপড়ির মতো, গোলাপের কুঁড়ির মতো সুন্দর সে। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে মিস লাহিড়ী মনে-মনে বললেন, "নয়নতারা ঠিকই অনুমান করেছে। এমন রূপসী কখনো ভালো লোকের মেয়ে হতে পারে না। ব্রজসুন্দরকে যদি এর ফল ভোগ করতে না হয়, তবে আর কী বলেছি!"

বিষণ্নমুখে মিস লাহিড়ী বিদায় নিলেন। মণিমালা ভাবে মণিকা-মাসিমাও খুব ভালো লোক। কিন্তু উনি যে এ বাড়িতে থাকেন না সেটা

আরও ভালো। সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলবিধানের ভার মণিকা-মাসিমাকে দিয়ে ভগবান নিশ্চিন্তে দু-সপ্তাহের ছুটি নিতে পারতেন।

আরও রাত হয়। মণিমালার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কতক্ষণ আর মামার জন্যে একা-একা উদ্বিগ্ন হওয়া যায়। অন্য দিন মা বেশ—

বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা যায়। মামা বাড়ি ফিরছেন।

মণিমালা হাসিমুখে বেরিয়ে আসে। মামার মুখ গম্ভীর। সহসা মণিমালা কী বলবে তা ভেবে পায় না। "একেবারে খেয়ে-দেয়ে উপরে গেলে ভালো হত না মামাবাবু?"

"আমার আজ খিদে নেই। সব ভালো তো? তোমরা খেয়েছ?"

মণিমালা সকলের মঙ্গল সংবাদ জানায়। আয়ার কথা বলে, মায়ের আচরণ কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করে বিবৃত করে অবশেষে বলে, "না, তুমি না খেলে আমিও খাব না।"

ব্রজসুন্দর আশ্চর্য হয়, এক্ষুনি মনে হচ্ছিল এই পৃথিবীর মতো কঠিন ঠাঁই আর হয় না, আর এক্ষুনি মামা কেন খাবে না বলে মণিমালা কেঁদে আকুল!

"আচ্ছা, আচ্ছা, খাবার দিতে বল। একেবারে খাওয়া-দাওয়া সেরেই উপরে যাওয়া যাক। কিন্তু আমি নিচে শোব মনে আছে তো? আমি খেয়ে-দেয়ে উপরে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে আসি, তুই বিছানাটা করে ফেলিস ততক্ষণে।" মণিমালাও প্রসন্ন হয়ে বলে বিছানা তৈরি হয়েই আছে। খেতে বসে ব্রজসুন্দর আরও গল্প করে, "কাল সুরেনকে দিয়ে নিচের ঐ খালি শোবার ঘরটাতে আমার জিনিসপত্র নামিয়ে নিস। এখন থেকে আমি ওখানেই থাকব। ছোট ছেলেপুলেদের একতলায় না থাকাই ভালো। সুরেনটা কুড়ে হয়ে যাচ্ছে রে, বিছানা-টিছানা ওকে দিয়ে করাবি। লোকটা ভালো, কিন্তু একটি আস্ত অপদার্থ।"

নার্সের খাবার উপরে যায়। চাকর-বাকরের আহার সাঙ্গ হয়। গৃহে নিদ্রা এসে পক্ষ বিস্তার করে।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৩ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মিস লাহিড়ী বিদায় গ্রহণ করবার পরও বহুক্ষণ অবধি হেমনলিনী দেবী বসবার ঘরের স্তিমিত দীপালোকে বসে রইলেন।

মন্দিরা এসে একবার রাত্রের রান্নাবান্নার কথা জেনে গেল। মাসিমা উদাস কণ্ঠে বললেন, "এ বেলার এত খাবার বেঁচে গেল মন্দিরা, আবার কেন রাঁধাবাড়ার হাঙ্গামা করতে যাবে?" মন্দিরাও নিঃশব্দে বিদায় নিল।

বাড়ির চারখানি ঘষামাজা ঘরে নিখুঁত শৃঙ্খলা বিরাজ করছে! মন্দিরা ভাবে হায়, ঘরের জিনিস ওলটপালট করবারও কেউ নেই এ বাড়িতে! নিজের ছোট-ছোট ভাইবোনগুলির কথা মনে পড়ে। সাত বছর হল সেখান থেকে শিকড়বাকড় সুদ্ধ হৃদয়খানিকে উপড়িয়ে এনেছে মন্দিরা। যারা শিশু ছিল দিনরাত ছোট-ছোট আবদার করে পাগল করে নিত, তারাই এখন বড় হয়ে সলজ্জ গাম্ভীর্যে মন্দিরার সুখসুবিধে দেখাশোনা করে। তাদের সেই হারানো শৈশবের জন্য মন্দিরা আজ খানিকটা কাঁদল।

জীবনের আরেকটি শনিবার তার সুখের ইঙ্গিত নিয়ে বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল।

উঠে পড়ে চোখেমুখে জল দিয়ে মন্দিরা জানলার কাছে দাঁড়াল। শীতের সন্ধ্যা, এরই মধ্যে চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে পথে গাড়ি চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর মন্দিরার বাগানের হাস্নাহানার গন্ধ খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসছে।

হাত বাড়িয়ে জানলা বন্ধ করে দিতে যাবে, সহসা দীর্ঘদিন পরে কানে যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর বেজে উঠল। নিমেষে মন্দিরার মুখ পাংশু-

বর্ণ ধারণ করল। পলক না ফেলতে, মুহূর্তের জন্য অতীত এসে হৃদয়-দ্বারে করাঘাত করল।

মন্দিরা জানলা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে দাঁড়াল। তার শিরার মধ্যে শোণিত-ধারা ক্রমে আবার স্বাভাবিক ছন্দে প্রবাহিত হতে লাগল। সে উপলব্ধি করল সাত বছর আগেকার সেই তরুণী মন্দিরা মরে গেছে।

আলো জেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মন্দিরা কঠিন সমালোচকের দৃষ্টিতে নিজের মুখখানিকে বিচার করল। দেখল এ মুখে প্রফুল্লতা আছে কিন্তু কোমলতা নেই, ক্ষমতা আছে কিন্তু মমতা নেই; বুদ্ধির দীপ্তি আছে কিন্তু হৃদয়াবেগের লেশ নেই। ভাবল এই ভালো, এখানে কোনো দুর্বলতা স্থান পায়নি। এইরকম মানুষরাই কাজের মানুষ হয়।

অন্যমনস্কভাবে চুলগুলি খুলে দিল, ভ্রমরকৃষ্ণ চুলগুলি কটিদেশ পর্যন্ত আলম্বিত হল। আয়নার মুখখানি সহসা একটু কোমলতা ধারণ করল। মন্দিরা তার পুরোনো ব্রাশখানি তুলে নিয়ে ধীরে-ধীরে চুল ব্রাশ করতে লাগল।

আস্তে দরজায় টোকা দিয়ে উত্তরের অপেক্ষা না রেখে মাসিমা প্রবেশ করলেন। দরজায় টোকা দেওয়া এ বাড়ির একটা অনুষ্ঠান। মন্দিরা জিগগেস করল, "একি মাসিমা, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?"

মাসিমা সংক্ষেপে বললেন, "না।"

অহরহ দিবারাত্র মন্দিরাকে কত না পরামর্শ দিয়েছেন, কত না আদেশ করেছেন। এখন মাসিমার কেন বাক্যস্ফূর্তি হয় না? যার আচরণের প্রতিটি খুঁটিনাটির উপর চিরদিন এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছেন, হৃদয়ের কথা তাকে কেমন করে বলা যায়? দুজনের মাঝখানে যে প্রাচীর সাত বছর ধরে সযত্নে রচনা করেছেন, সহসা তাকে লঙ্ঘন করে আসল কথাটি কেমন করে বলা যায়?

মন্দিরার দয়া হল। হাতল দেওয়া পুরোনো ছোট গোল চেয়ারখানি টেনে এনে, হাত ধরে মাসিমাকে বসিয়ে দিয়ে নিজে খাটের উপর বসে

আবার জিগগেস করল, "একটা কিছু হয়েছে, না মাসিমা? মণিকা-মাসিমা কিছু বলেছেন? খুলেই বল না।"

মাসিমা বললেন, "ব্রজসুন্দরের সঙ্গে তোমার কী করে আলাপ হল, মন্দিরা?"

মন্দিরা বিস্মিত হয়ে গেল। "ব্রজসুন্দর? ব্রজসুন্দর বলে কাউকে তো আমি চিনি না।"

"সে কি মন্দিরা, সাত বছরে এই প্রথম তুমি মিথ্যে কথা বললে? আমি জানি তুমি ব্রজসুন্দরকে চেনো। তোমাকে যে ছোট লাল ব্যাগ দিয়েছিলাম, তুমি তাকে সেটি দিয়েছ। কেন মন্দিরা, আমার কাছে সব গোপন করেছ কেন?"

মন্দিরা অবাক হয়ে বলে, "বিশ্বাস কর মাসিমা, আমার হ্যাণ্ডব্যাগে ওটা থাকে, কিন্তু আজ সকাল থেকে ওটা খুঁজে পাচ্ছি না। ট্রামে উঠে বিপদেই পড়েছিলাম, আমার সমস্ত ভাঙানো পয়সা ওতে থাকে। ভাগ্যিস সতুদা সেই ট্রামে উঠেছিলেন, আমার নোট ভাঙিয়ে দিয়ে উদ্ধার করলেন। ব্রজসুন্দর বলে কাউকে আমি চিনি না। আমার ব্যাগ সে পেল কোথায়? মণিকা-মাসিমাই বা এর মধ্যে এলেন কী করে?"

মাসিমা নীরব রইলেন।

মন্দিরা অসহিষ্ণুভাবে বললে, "তুমি কি বলতে চাও আমি মিথ্যে কথা বলছি?"

"না, মন্দিরা।" মাসিমা উঠে পড়েন। মন্দিরা ব্যাকুল হয়ে বলে, "মাসিমা, অমনি করে চলে যেও না। মণিকা-মাসিমা কী বলেছেন বলে যাও।"

মাসিমা মাথা নেড়ে বলেন, "নাঃ, থাক! তুমি যখন ব্যাগের কথা কিছুই জানো না, তোমার শুনে কাজ নেই। কথাটা ছেলেমানুষের শোনবার মতোও নয়।"

"আমার সাতাশ বছর বয়েস, মাসিমা, আমার শরীরে বা মনে

কোথাও ছেলেমানুষীর লেশমাত্র নেই, তা কী তোমার চোখে পড়েনি?"

তারপর খাট থেকে উঠে পড়ে মাসিমার কাছে এসে মন্দিরা বললে, "তোমাতে আমাতে বয়সে কোনো তফাত নেই, দেখছ না মাসিমা?" একটু হেসে বললে, "একসঙ্গে থেকে-থেকে দুজনে একধরনের হয়ে গেছি, যেমন কুকুর নাকি তার মনিবের মতো দেখতে হয়ে যায় শুনেছি। একই জিনিস পছন্দ করি, একই ধরনের মত প্রকাশ করি, একই ভাবে দিন কাটাই।"

মাসিমা তবু বলেন, "আজ বড় ক্লান্ত বোধ করছি, মন্দিরা, আরেক দিন বলব। এখন খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে শুয়ে পড়ি গিয়ে।"

মন্দিরা সিঙাড়া গরম করে দেয়, মাসিমার জন্যে হর্লিক্স তৈরি করে এনে দেয়। জল গরম করে ব্যাগে ভরে তাঁর বিছানার মধ্যে দিয়ে আসে।

মাসিমার দুশ্চিন্তার অবধি নেই। "কালও যদি খনার মা না আসে? সকালে উঠে তোমার চা করতে কষ্ট হবে না? আমার ঐ ছ'টার সময়ে চা খাওয়া অভ্যাসটা তুলে দিতে হবে।"

মন্দিরা চকিতে একবার মাসিমার মুখ দেখে নিয়ে বলে, "কাল ছ'টার মধ্যে চা কেনই বা পাবে না! খনার মা না এলে কী এসে যায়!"

মন্দিরা রাত্রের মতো জানলা বন্ধ করে দেয়। মনে ভাবে মাসিমা যদি অতটা স্বাবলম্বী না হতেন ভালোই হত। কারো উপরে যদি সর্বদা নির্ভর করতেন, আমাকে যদি বলতেন চুল বেঁধে দিতে, কাপড়গুলি ভাঁজ করে তুলতে, তবে কেমন হত? ভাবে, আমাদের যদি একটা পোষা কুকুরছানা থাকত তবে কেমন হত? ভাবে, আমার সব থেকে ছোট ভাইটি যদি এসে এক মাস এখানে থাকত! না, তাও কি সম্ভব? সে এসে মাসিমার কাঁচের জিনিস সব ভেঙে ফেলত, কাদা-মাখা জুতো দিয়ে ঘর-দোর সব নোংরা করত, যখন-তখন খেতে চাইত, সকালে দেরি করে উঠত। না,

মোটে তার বারো বছর বয়েস, সে এলে চলত না। কিন্তু একটা বেড়াল-ছানাও যদি থাকত!

মন্দিরা সারা বাড়ি পরিদর্শন করল। রান্নাঘরের জানলার ছিটকিনি পরীক্ষা করল। কোথায় যেন দু-একখানি ইংরিজি ডিটেকটিভ বই পড়ে অবধি মাসিমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে গেছে যে চোরেরা বেশির ভাগ সময়ে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে গভীর রাত্রে প্রবেশ করে থাকে। রান্নাঘরের পিছনের দরজা খুলে লাইট জেবলে প্রতিদিনের মতো বাগানটার উপরে সে তাকাল। বসবার ঘরের দরজা বন্ধই ছিল, ছিটকিনি ও খিল লাগিয়ে দিল। আগে সদরদরজায় মোটা চেন দিয়ে বিশালকায় তালা লাগানো হত তার ছ'ইঞ্চি লম্বা চাবি ছিল, দোতলায় ভাড়াটে এসে অবধি সদর দরজা খোলা থাকে। মাসিমার মন খুঁতখুঁত করলেও কোনো উপায় নেই, ভাড়াটেদের বাড়িতে গভীর রাত পর্যন্ত অতিথিরা আনাগোনা করে। মন্দিরাও আজকাল ঐ খোলা দরজার কথা স্মরণ করে কেমন যেন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। ভয় একটা সংক্রামক ব্যাধি।

চারদিকে একবার তাকিয়ে আলো নিবিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময়ে দরজায় শুনল মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট করাঘাত।

মন্দিরার হৃৎপিণ্ড দ্রুতবেগে স্পন্দিত হতে লাগল। নিশ্বাস রোধ করে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করল। আবার কে যেন করাঘাত করল। আলো জেবলে সে দরজা খুলে দিল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মন্দিরার ছোট বোন অনিলা। তার বিবর্ণ মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তাকে ঘরে টেনে এনে মন্দিরা দরজা বন্ধ করল। অনিলা তার খাটো কোঁকড়া চুলের বেণী কপাল থেকে সরিয়ে সপ্রতিভ দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে চেয়ে বললে, "পালিয়ে এসেছি দিদি, আমাকে লুকিয়ে রাখ।"

"পালিয়ে এসেছি মানে? মা-বাবাকে বলে আসনি?"

"না, না, তা হলে আর আমার আসা হত না। এমনি চলে এসেছি, কাউকে না বলে। সঙ্গে কোনো জিনিস না নিয়ে, এমনি একলা চলে

এসেছি। ওরকম করে তাকাচ্ছ কেন, দিদি, সেখানে আমি মরে যাচ্ছিলাম, একটু-একটু করে, তিলে-তিলে মরে যাচ্ছিলাম। তুমি এখানে দিব্যি থাক, ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াও, তুমি কি করে বুঝবে?"

"মা-বাবা যে ভেবে আকুল হবেন সে কথা কি একবারও মনে হয়নি?"

"বেশ হবে, ভালো হবে। পুরোনো হয়ে যাচ্ছিলাম, আটপৌরে হয়ে যাচ্ছিলাম। গরিবদের বোকা হওয়া উচিত, কালো কুৎসিত হওয়া উচিত। তাহলে তাদের দুঃখ থাকবে না, মনে হবে না জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল।"

"তা তুমি বেশ বোকা আছ, বাপু। আর বড়লোকদেরও জীবন ব্যর্থ হয়ে যেতে শোনা গেছে। এত রাত করে এলে কেন? খেয়েছ কিছু?"

"সকালে পৌঁছেছি, আমার বন্ধু মিনির বাড়িতে সারাদিন ছিলাম। সন্ধ্যেবেলা সিনেমা দেখেছি, রাত্রে চীনে খাবার খেয়েছি। ওরাই আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল, নইলে আমি বাড়ি চিনব কী করে? দেখ, মিনির শাড়ি জামা পরে এসেছি। কী সুন্দর দেখ, মানিয়েছে না?"

অনিলা ঘুরে-ফিরে তার বেশভূষা দেখায়, নীরবে মন্দিরা তাকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। ক্লান্তভাবে নিজে বসে পড়ে, অনিলা ঘরময় পাইচারি করে বেড়ায়।

"মাসিমা কী বলবেন বল তো? বলা নেই, কওয়া নেই, হট করে এসে পড়লে। কাল সকালেই মডেল স্টোর থেকে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে একটা ট্রাঙ্ক কল করে জানিয়ে দিতে হবে, যে তুমি এখানে আছ। সারারাত তাদের যে কী ভাবে কাটবে কে জানে!"

অনিলা রাগ করে বলে, "সে তো কাল রাতও কেটেছে। অত অবুঝ আমি নই দিদি। চিঠি লিখে রেখে এসেছি। বইয়ে যেমন করে, সেই-রকম বালিশের উপর আলপিন দিয়ে আটকে রেখে এসেছি। বেশ মজার, না?"

মন্দিরা অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলে, "ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয় অনিলা, কী এমন হল যার জন্য হঠাৎ রেগেমেগে চলে এলে? দুদিন আগেও তো মা'র চিঠি পেয়েছি, কিছু তো লেখেননি।"

"হাঁপিয়ে উঠলাম, চলে এলাম, এর চেয়ে বেশি আবার কী কারণ দরকার! এমন একটা মুহূর্ত আসে না কি জীবনে যখন মনে হয় আর এক মিনিটও সহ্য করতে পারব না, এক্ষুনি একটা কিছু করে ফেলতে হবে। এরকম কখনো মনে হয় না তোমার? কতই বা বড় তুমি আমার চেয়ে, বড় জোর দু-বছরের বড়।"

তারপর মন্দিরার পরিপাটি ঘরখানির চারদিকে চেয়ে অনিলা বলে, "বাঃ, বেশ তো পরিষ্কার শাদা ঘর, কি পরিষ্কার বিছানা! আমাদের বাড়ির বিছানাগুলো মনে আছে? তোমার সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু বড় সেকেলে, আউট অফ ডেট। এ রকম কারিকুরি করা, উঁচু মাথাওয়ালা খাটে কেউ শোয় আজকাল? এইরকম গলা এঁটে ধরা নাইট সেমিজ তুমি ছাড়া কেউ পরে? আমার কথা শোনো, ওটিকে কোনো মিউজিয়মে পাঠিয়ে দাও, পাঁচজনে দেখে আমোদ করবে।"

তারপর ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসে পড়ে বলে, "উঃ দিদি, মিনির বাড়ির জিনিসপত্র যদি দেখতে। সব শিরা বার করা কাঠের আর ক্রোমিয়ামের জিনিস, দেয়ালে সব কাঠখোদাই ঝুলছে, অদ্ভুত সব নিগ্রো মেয়েদের চেহারা। খাবার টেবিলটা এত নিচু যে প্রায় হামাগুড়ি দিতে-দিতে খেতে হয়। ছোট-ছোট লেশের ডয়লির উপর পাইরেক্সের প্লেটে রুপোর কাঁটা দিয়ে খেলাম আমরা জানো, ঐ রকম করে জীবনযাপন করতে হয়, তুমি কোনো কাজের নও।"

মন্দিরা এত সব কথার কোনো উত্তর না দিয়ে একটু হেসে বললে, "আমি যাই হই না কেন, তুমি নিজে খুব কাজের হলেই হবে। এখন মুখ ধুয়ে শুয়ে পড় তো। আমি বরং নিচে একটা বিছানা পাতি।"

অনিলা দিদির গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে গালে গাল ঘষে বলে,

"সেকেলে হলেও তুমি নিজে বড় ভালো, তোমার কাছে এসে মনটা ভালো হয়ে গেল!"

মন্দিরা বললে, "কেন, মিনির কাছে কি মনটা খারাপ ছিল?"

"না, খারাপ নয়, তবে কী জানো ওরা এত ফ্যাসানেব্‌ল্‌ লোক যে সারাদিন ভয়েই মরি কী করতে গিয়ে কী করে বসব, শেষে ওদের চাকররা হাসুক আর কি! বুঝলে না দিদি?"

কিন্তু দিদি বোঝে না, মিনির বাড়ির চাকররা কী মনে করবে তাই নিয়ে এত দুশ্চিন্তা, অথচ মা-বাবাকে এত উদ্বিগ্ন করেও দিব্যি নিশ্চিন্ত! ভাবলে সত্যিই আমার বয়েস হয়ে গেছে, মাসিমাতে আমাতে বাস্তবিকই আর কোনো তফাত নেই।

দিদি মাটিতে শুলে অনিলা খাটে শুতে রাজী নয়, অগত্যা দুজনেই খাটে শোয়। অনিলা তক্ষুনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়, কিন্তু মন্দিরার চোখে ঘুম আর আসতে চায় না।

নিদ্রাহীন চোখ দুটিকে অন্ধকারের উপর নিবন্ধ করে মন্দিরা ভাবে এ শনিবারটা অন্য দিনের মতো নয়। কোথায় কুকুরছানার কথা ভাবছিলাম, এখন তো অনিলা এসেছে তবুও মনটা কেন আনন্দে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে না? মাসিমা কী বলবেন অনিলাকে দেখে? মাসিমাও আজ কেমন যেন অন্য রকমের হয়ে গেছেন। সত্যি ব্রজসুন্দর কে? আশ্চর্য নয় কি যে এ-বাড়িতে মন্দিরার কোনো পুরুষ-বন্ধু কখনো পদার্পণ করেনি? আশ্চর্য নয় কি যে মন্দিরার সাতাশ বছর বয়েস হল, কত লোকের সঙ্গে আলাপ হল, কত ভালো-ভালো লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, মন্দিরার জীবনে কত মেয়েদের ভিড়, কিন্তু মন্দিরার অন্তর্লোক পর্যন্ত কেউ পৌঁছাতে পারল না।

আস্তে-আস্তে অনিলার কোঁকড়া চুল স্পর্শ করে সে ভাবে আমরা দুজনে সহোদরা কিন্তু দুই জগতে আমাদের বাস। এ সংসারে কেউ কারো অন্তরবাসী হয় না, হৃদয়ের সুখ-দুঃখ কারো সঙ্গে ভাগ করে

নেয়া যায় না। মন্দিরার হৃদয় সমুদ্রের বুকে ছোট একখানি দ্বীপের মতো, তার চারদিকে উদ্দাম অলঙ্ঘ জলের রাশি।

সকালে উঠতে দেরি হয়ে যায়। মাসিমা ছ'টার সময়ে চা পান না। সাতটার সময়ে যখন লজ্জিত মুখে মন্দিরা চা নিয়ে মাসিমার ঘরে প্রবেশ করে, মাসিমা উঠে পড়ে, হাত মুখ ধুয়ে, অপ্রসন্ন মুখে বিছানা তুলতে ব্যস্ত। মন্দিরা ছোট টি-পয়তে চায়ের ট্রে নামিয়ে রেখে, মাসিমার হাত থেকে বালিশ কেড়ে নেয়। "ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মাসিমা, কথা রাখতে পারিনি।"

মাসিমা তার মুখের দিকে চেয়ে বলেন, "তোমার স্নানের ঘরে কে গান গাইছে মন্দিরা?"

মন্দিরা ক্ষিপ্র হাতে মাসিমার বিছানা পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখতে-রাখতে অনিলার কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করে, মাসিমার রুষ্ট সমালোচনার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে।

অনিলা তখনো স্নানের ঘরে গান গাইছে, আশ্চর্যের বিষয়, মাসিমা সহানুভূতি প্রকাশ করলেন, "তোমার মায়ের যেমন কাণ্ড! আমার চেয়ে পাঁচ-বছরের ছোট সে, সতেরো-বছর বয়সে, সাত তাড়াতাড়ি নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করে বসল। কী এমন ভালো পাত্র? দেখতে-শুনতে খুব ভালো, কথাবার্তাও চমৎকার, কিন্তু ঐ পর্যন্তই! সারাটা জীবন নির্মলা কষ্ট করে কাটাল। ঐ সামান্য টাকায় এতগুলো ছেলেপুলে মানুষ করা কী সোজা কথা? আমি কতবার বলেছি এক-আধটি আমাকে দে, ভালো করে মানুষ করি। তা কিছুতেই শুনবে না। নিতান্ত ঘটনাচক্রে পড়েই তোমাকে পাঠিয়েছিল। ওখানে ঐ অনটনের মধ্যে অনিলার যে ভালো লাগবে না এ আর বিচিত্র কি? কদ্দুর লেখাপড়া করেছে সে?"

মন্দিরা জানায় যে আই-এ পাশ করে সে আর কিছুতেই পড়তে রাজী হয়নি। তবে বেশ গান করে। পাটনায় গাইয়ে বলে সুখ্যাতিও আছে।

"তোমার মা'র মতো দেখতে হলে তো ভালোই দেখতে হবে। ঐ রূপ নিয়ে ওর কত বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হতে পারত, তা তখন তো কিছুতেই কারো কথা শুনলে না। এখন অনুতাপ করে জীবন কাটাচ্ছে। ভিত আরও শক্ত করে গাঁথতে হয়, শুধু রূপ আর রোম্যান্সে চলে না।"

মন্দিরার অন্তঃকরণ মা'র জন্য অস্ত্র ধারণ করল। "কেন মাসিমা, অনুতাপ করবেন কেন, মা বেশ সুখী।"

"আমার নিজের বোনকে আমি জানি না, মন্দিরা! তা ছাড়া কত বার কত দুঃখ করে আমাকে চিঠি লিখেছে। ছ-সাতটা ছেলেমেয়ে নিয়ে কাছে এনে যে রাখব তারও যো নেই!"

মন্দিরা আর কোনো কথা বলে না। কাজ সেরে ঘরে গিয়ে অনিলাকে তাড়া দেয়।

"ভাগ্যিস গরম জল করে দিলে দিদি। এখন থেকে মনে করেছি রোজ ঘুম থেকে উঠে গরম জলেই স্নান করব। মিনি বলছিল সব স্মার্ট লোকরা তাই করে। তাদের বাড়িতে গরম জলের কী সুবিধে। স্নানের ঘরে ট্যাঙ্ক লাগানো, তাতে গ্যাসে জল গরম হয়। তোমরা একটা লাগিয়ে নাও না কেন?"

"তোমার যখন নিজের বাড়ি হবে ও-সবই কোরো অনিলা, মাসিমাকে দিয়ে যে কিছু করাতে পারবে তা আমার মনে হয় না। যে জিনিস বাঙালী ভদ্রসমাজে অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে চলে আসেনি, এ বাড়িতে তা ঠাঁই পাবে না।"

"আহা, আমি শৌখিন জিনিসের কথা বলছিলাম।"

"এখন চল তো আমার সঙ্গে রান্নাঘরে, খনার মা'র অসুখ, টোস্ট বানাবে চল।"

প্রাতরাশের সময়ে মাসিমার সঙ্গে অনিলার দেখা হল। অনিলা মাসিমাকে প্রণাম করে হাসিমুখে দাঁড়াতেই মাসিমা তার মিষ্টি মুখ দেখে খুশি হয়ে তার গালে একটি চুমো খেয়ে বললেন, "মা-বাবাকে এক্ষুনি একটা খবর দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দেবে, বল এখন কদিন আমার কাছেই থাকবে।"

মন্দিরা একখানি চিঠি নিয়ে ধীরে-ধীরে প্রবেশ করে। পাঠান্তে নীরব বসে থাকে। মাসিমা জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতেই চিঠিখানি তাঁর হাতে গুঁজে দেয়। মন্দিরার নিজস্ব বলে তার অন্তর ছাড়া আর কিছু নেই।

ব্রজসুন্দর চিঠি লিখেছে। লিখেছে : মাননীয়াসু, ঘটনাক্রমে আপনার হারানো মানিব্যাগ আমার হাতে এসে পড়েছে। অনুমতি পেলে আপনাদের বাড়ি গিয়ে একদিন বিকেলে দিয়ে আসতে পারি। ইতি—

আপত্তি করবার কিছু নেই চিঠিখানিতে। বরং মন্দিরার সঙ্গে ব্রজসুন্দরের অপরিচয়টাই প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু মাসিমার নিশ্চল দৃষ্টির সম্মুখে মন্দিরার মুখ রক্তিম আভা ধারণ করে।

অনিলা কৌতুক বোধ করে। প্রশ্ন করে, "ব্যাপার কী? কে এই ব্রজ-সুন্দর? কি সেকেলে নাম বাপু। ওসব লোককে আমল দিতে নেই। নিশ্চয় কোঁকড়া তেল-চুকচুকে চুল, ফরসা গোল মুখ আর শরীরটি দিব্যি নধর—পান খায় নিশ্চয়ই, দাঁত নিশ্চয়ই কালো।"

মন্দিরা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, "তুমি থাম অনিলা। ব্রজসুন্দরকে আমি কখনো চোখে দেখিনি। কালকের আগে তার নামও শুনিনি।"

মাসিমা বলেন, "একটু কৌতুকও সইতে পার না, মন্দিরা? সত্যিই তুমি আমি দুজনেই বুড়ো হয়ে গিয়েছি।"

মন্দিরা ভাবে সত্যি সাত বছর ধরে তিলে-তিলে আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি। আমি নিয়ম ভালোবাসি, শৃঙ্খলা ভালোবাসি, শান্তি ভালোবাসি। আমি আবেগ ভয় করি, উদ্বেগ ভয় করি, বিলাস ঘৃণা

করি, চাঞ্চল্য ঘৃণা করি। আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি।

মাসিমা অনিলাকে প্রশ্ন করতে বসলেন, মন্দিরা সেই অবসরে মা-বাবাকে তার করে দিয়ে এল।

খনার মা বিরস মুখে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়, সঙ্গে তার বোনপো ন্যাপলা, গজেনের উত্তরাধিকারীর পদপ্রার্থী। মাসিমার মন আজ খুশিতে ভরপুর, ন্যাপলা কাজে বহাল হয়ে গেল।

মন্দিরা ফিরে আসতেই মাসিমা প্রসন্নমুখে বলেন, "আমাদের অনিলা পড়াশুনোও করতে চায় না, চাকরিও করতে চায় না। ও তোমার মতো নয় তাহলে। আপাতত গান শুনিয়ে তোমার-আমার বয়সটা ও কমাতে পারে কিনা পরীক্ষা করা যাক, কি বল? জিনিসপত্রও তো কিছু আনেনি বলছে, তোমার যা আছে তাতে কি চলে যাবে? যা-যা দরকার হয় কিনে নিও, আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেও।"

মন্দিরা ভাবে তার যা-কিছু সবই অনিলার জন্য; এবং এমন কতকগুলি জিনিসও কিনতে হবে যেগুলিকে মন্দিরা প্রয়োজনীয় মনে করে না, কিন্তু অনিলা নিশ্চয়ই করবে। সেগুলি মন্দিরাই কিনে দেবে, মাসিমা কেন দেবেন?

কিন্তু অনিলা বলে বসে, "তা হলে, মাসিমা, আমি একজোড়া লাল স্ট্র্যাপ-দেওয়া জুতো আর একটা লাল হ্যান্ডব্যাগ কিনব, টাকা দেবে তো? দিদির ব্যাগ ব্রজসুন্দর ফিরিয়ে দেবে, আমাকে তো আর দেবে না!"

ব্রজসুন্দরের কথা মনে পড়াতে হেমনলিনী দেবীর মনে হয় চিঠির কী উত্তর দেওয়া হবে? মন্দিরা দেবে না তিনি দেবেন? তিনি দিলেই ভালো।

"তুমি চিঠিটা আমার কাছে রেখে যাও মন্দিরা, আমিই জবাব দিয়ে দেব। ওকে এনকারেজ করা উচিত না, লিখে দেব ব্যাগ পৌঁছে

দেবার দরকার নেই, আমরাই চাকর পাঠিয়ে আনিয়ে নেব। আমি ওদের বাড়ি চিনি, ওরা মণিকাদের পাশের বাড়িতে থাকে। লোকটি সুবিধের নয়।"

অনিলা শুনে খুশি হয়ে ওঠে। "তাই, মাসিমা, তুমি তাহলে ওদের জানো? বেশ তো আসুক না এখানে। দিদির যদি একটা হিল্লে হয়ে যায় মন্দ কি? মা তো হাল ছেড়েই দিয়েছে, হলই বা একটু নাদুস-নুদুস, নাই বা হল সুবিধের।"

মন্দিরা কোনো কথা না বলে খনার মাকে ভাঁড়ার বের করে দিতে চলে যায়।

একটু বেলা বাড়লে অনিলাকে নিয়ে কেনাকাটা করতে বেরোয়। রবিবার বাঙালী পাড়ার দোকানপাট খোলা থাকে, লাল জুতো আর লাল হ্যাণ্ডব্যাগ দুটোই কেনা হয়।

"তুমি যদি পাটনায় ফিরবে না স্থির করে থাক অনিলা, এমনি ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না। মাসিমার এমন কিছু ভালো অবস্থা নয়, বিশেষ করে এ-বছরটার গোড়া থেকে। দেখছ তো দোতলাটা ভাড়া দিয়ে দিতে হয়েছে।"

"আমার জন্য কত আর বেশি খরচ হবে? তোমার জন্যও তো সেটুকু হয়।"

মন্দিরা বিরক্ত হয়ে বলে, "ইচ্ছে করে অবুঝ হয়ো না অনিলা। থাকা-খাওয়া না হয় মাসিমার উপর দিয়ে হল আমারও যেমন হয়। কিন্তু তাছাড়াও তো খরচ আছে—কাপড়-চোপড়, যাওয়া-আসা, কত কী।"

অনিলা অম্লানবদনে হেসে বলে, "বেশ তো মাসিমার কাছ থেকে নিলে তোমার যদি অপমান বোধ হয়, তুমি তো চাকরি কর, মাইনে পাও, তুমিই না হয় ছোট বোনটিকে দিও। মাসিমার সঙ্গে কথা হয়েছে আমি ভালো করে গান শিখব। সেটাকে কী তুমি কিছু করা বল না?"

দুজনে বাড়ি পৌঁছে যায়, আর কোনো কথা হয় না।

সন্ধ্যেবেলা ব্রজসুন্দর এসে উপস্থিত হয়। অনাহূতভাবে খোলা দরজায় একবার করাঘাত করে ভিতরে এসে প্রবেশ করে।

অনিলা গান গাইছিল, হেমনলিনী দেবী ও মিস লাহিড়ী গান শুনছিলেন, মন্দিরা আলোর কাছে বসে রঙিন রেশমী সুতো দিয়ে সূচীকর্মে নিবিষ্ট।

সকলেই বিস্মিত হয়ে ব্রজসুন্দরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মন্দিরা দেখলে সে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। আর অনিলা গান থামিয়ে চেয়ে দেখল লোকটি বেশ রূপবান।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৪ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

রঙিন পর্দাটার সামনে ব্রজসুন্দর দাঁড়িয়ে রইল, দীর্ঘ দেহে ঈষৎ ক্লান্তি, গৌর মুখে লজ্জার রক্তিমা।

মন্দিরা উঠে এল। "বসুন দাঁড়িয়ে থাকবেন না। কোনো দরকারে এসেছেন, না?"

ব্রজসুন্দর ছেলেমানুষের মতো বললে, "আমি ব্রজসুন্দর, আপনার ব্যাগ দিতে এসেছি।"

মিস লাহিড়ী তখন নীরবতা ভঙ্গ করলেন, "আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমার দিদির বন্ধু মণিকা লাহিড়ী, তোমার প্রতিবেশিনীও বটে।"

ব্রজসুন্দর একটি ছোট নমস্কার করলে, সত্যিই প্রথম দর্শনে মিস লাহিড়ীকে চিনে উঠতে পারেনি।

হেমনলিনী দেবীরও কর্তব্যজ্ঞান আছে। তিনি মন্দিরাকে চা আনতে আদেশ করলেন। অনিলা হাসিমুখে বসে রইল।

"তোমার কথা মণিকার কাছে শুনেছি। তুমি হাইকোর্টে ওকালতি কর, না? বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে এলে না কেন? তাহলে আরও বেশি উন্নতি করতে পারতে।"

ব্রজসুন্দর সবিনয়ে নিবেদন করে বিলেত সে গিয়েছিল এবং সেখানকার বি. এ. ডিগ্রীও এনেছিল, তবে সেটি শৌখিন জিনিস, বিশেষ কাজে লাগে না।

হেমনলিনী দেবী আশ্চর্য হন। সে কি! বিলিতি ডিগ্রী কি ফেলনা জিনিস? হেমনলিনী দেবীর পিতা ও স্বামী বিলিতি ডিগ্রীর শক্তি

দিয়ে প্রচুর অর্থ ও সম্মান উপার্জন করে গিয়েছিলেন, একথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

হেমনলিনী দেবীর কথা শুনে মিস লাহিড়ীও আরও অনেক কথা বললেন—এখানকার এডুকেশন আবার একটা এডুকেশন নাকি? তিনি নিজে সরকারি বৃত্তি নিয়ে এক বছরের জন্য বিলিতী ট্রেনিং নিয়ে এসেছিলেন, তাতে তাঁর দৃষ্টি খুলে গেছে। ওখানকার ম্যাট্রিক পাশ করা ছেলেমেয়েরা এখানকার গ্র্যাজুয়েটদের চেয়ে ভালো। কত খবর রাখে তারা, কী ডিসিপ্লিন, কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কী কর্মক্ষমতা! বিলিতি শিক্ষার ফলে মিস লাহিড়ী জন্মান্তরে বিশ্বাস করা ছেড়ে দিয়েছেন, নইলে বলতেন—বহু পাপ করলে তবে এদেশে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এদেশে একটিও মানুষের মতো মানুষ নেই। মহাপুরুষদের কথা অবিশ্যি আলাদা।

যাই হোক দুজনে মিলিত কণ্ঠে ব্রজসুন্দরকে বোঝালেন বিলিতি ডিগ্রীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাতে তার বিষম ভুল হয়েছে। গেলই যদি ব্যারিস্টার না হয়ে ফিরে আসাটাও তার ভারি অন্যায় হয়েছে, দেশের প্রতি কর্তব্যপালনও হয়নি।

ব্রজসুন্দর ঘর্মাক্ত-কলেবর হয়ে উঠল, তার আয়তলোচনে ভীতির চিহ্ন প্রকাশ পেল। মন্দিরা চা নিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করল।

মণিকা-মাসিমার শেষ কথাগুলি তার কানে গিয়েছিল, সে হেসে বললে, "ঈশ, আপনার জীবনটাই তা হলে ব্যর্থ হয়ে গেছে বলুন। ধরুন, গরম চা আর এই বিলিতী চীজ দিয়ে নিমকি করেছি। একেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে নেই, ধরুন।"

ব্রজসুন্দর স্বপ্নবিহ্বলের মতো মন্দিরার আজ্ঞা পালন করে।

মন্দিরা পাশে বসে পড়ে, অনিলাকে ডেকে এনে কাছে বসায়। "এই আমার ছোট বোন অনিলা, ব্রজসুন্দরবাবু, ও একজন ভালো গাইয়ে, আরও ভালো করে গান শিখতে চায়। আমি একটা আপিসে সেক্রেটারি-

য়েল কাজ করি। আপনাকে মনে হচ্ছে ট্রামে যেতে দেখে থাকব।"

ব্রজসুন্দর তখন ভাষা খুঁজে পায়, সংক্ষেপে ব্যাগ প্রাপ্তির কাহিনী বিবৃত করে।

মনের মধ্যে আর যে কথাগুলি আকুলি-বিকুলি করতে থাকে তার কিছুই বলা হয় না। কাজকর্মের কথা হয়, ট্রাম-বাসের কথা হয়, আসল কথা কিছুই বলা হয় না। ব্রজসুন্দর প্রাঞ্জল যুক্তি দিয়ে সহজ ভাষায় দিশী সিনেমার ও আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা করে। বর্তমান পরিস্থিতির পরিণাম বিষয়ে গবেষণা করে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না, সত্যি আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবার ভয় আছে। আমি যা শিখেছি আমার জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। আমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস হয়েছে, কিন্তু আজও জীবন-তরু পুষ্পপত্রে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। আমার একজনও বন্ধু নেই মণিমালা ছাড়া। কিন্তু মণিমালা এমনি স্টুপিড্ যে ওকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ব্রজসুন্দর বিদায় নেয়। সে চলে গেলে হেমনলিনী দেবী একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেন, "দেখতে-শুনতে মানুষটি বেশ, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে এত দুষ্ট দেখে তা কে বলবে। তোমরা ওর সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হবে, মেয়েরা। অত গল্প করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অমন করলে মাথায় চড়বে। এইসব হিন্দুসমাজের ছেলেরা শিক্ষিত মেয়েদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পায় না, ওদের লাই দিলেই মাথায় চড়ে বসবে।"

মন্দিরা তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলে, "মাসিমা, তুমি লেখাপড়া শিখেছ বলে এত গর্ব কর, অথচ নিজের মনের দরজা-জানলাগুলিই খুলতে পারনি। উনি ভদ্রতা করে আমার জিনিস দিয়ে গেলেন, তুমি তার মধ্যে থেকেও একটা মন্দ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করছ।"

মিস লাহিড়ী শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে নরম গলায় বললেন, "তোমাদের ভালোর জন্যই তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন, মন্দিরা। নইলে তোমার মাসিমার আর কী? ব্রজসুন্দরদের পরিবারও একেবারে অশিক্ষিত নয়, হেমনলিনী।"

মন্দিরা রাগ করে নিজের ঘরে চলে যায়। আজ সারা দিনটাই তার ভালো যায়নি।

ব্রজসুন্দরের দিনটাও ভালো যায়নি।

ব্রজসুন্দর ভাবে উত্তর মেরুতে যাওয়া বরং সহজ, কিন্তু বন্ধুর অন্তরে প্রবেশ করা সহজ নয়। এই দুদিনে সে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলেছে, গত কুড়ি বছরেও তা করতে পারেনি।

অনিলাও দিদির সান্নিধ্য খোঁজে। "মাসিমার উপর মিছিমিছি রাগ করলে কেন দিদি? কিছু তো মন্দ কথা বলেননি। মা-বাবাও তো বলেন যে যাদের বাড়ির মেয়েরা আমাদের বাড়ির ছেলেদের সামনে বেরোয় না, আমাদের বাড়ির মেয়েরাও তাদের বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না। তা নইলে সামাজিক শৃঙ্খলা নাকি থাকে না।"

মন্দিরার হাসি পায়।

"তবে কাদের কাদের সঙ্গে মিশতে হবে একটু আমাকে বাতলে দিস। কারণ আমার সঙ্গে যে কেউ ভদ্র ব্যবহার করে, আমিও তার সঙ্গেই ভদ্র ব্যবহার করি। কারো সঙ্গেই বেশি মিশি না। তাছাড়া আমাদের বাড়িতে ছেলেই নেই, যে পরখ করে দেখব।"

"ঐ জন্যই তো তোমার বিয়ে হয় না। বেশ তো চেহারা তোমার, আমার মতো রঙ না থাকলেও, দিব্যি ভালো চেহারা তোমার। সাজগোজ করবে না, লোকের সঙ্গে মিশবে না, ঘটকালি-করা বিয়ে করবে না, কাজেই আইবুড়ো থাকবে না তো কী?"

মন্দিরার রাগ পড়ে গেছে, সে বলে, "আর বিয়ের বয়স তো চলে গেছে রে, এসব পরামর্শ আগে দিসনি কেন?"

"দিদি, শঙ্করদের কোনো খবর পাও? ওরা সেই যে পাটনা ছেড়ে চলে গেল, আর কোনো খবরই নেই।"

মুহূর্তকাল নীরব থেকে মন্দিরা বললে, "ওদের কথা আমার মনে করবার সময়ই হয় না।"

"শঙ্করের সঙ্গে তোমার বিয়ে ওরা না চায়, না হয় না-ই হল। কিন্তু বাবার অমন ভালো ভূতের গল্পের বইখানা নিয়ে চলে যাওয়া ওদের কখনোই উচিত হয়নি।"

অনিলার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাপড়-জামা গুছিয়ে রাখতে-রাখতে মন্দিরা বললে, "কাল সকালে আমি যখন আপিস যাব, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে, তোমার বন্ধুর বাড়ির মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে ওর কাপড় ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। ফিরবার ট্রামে ভিড় থাকবে না, কোনো অসুবিধে হবে না।"

"না, দিদি, ট্রামে যাব কি? ওরা হয় বাড়ির গাড়িতে, নয় ট্যাক্সিতে চলাফেরা করে।"

মন্দিরা অনিলার পাশে এসে দাঁড়ায়, বলে, "মাসিমা চিরদিন নিজের গাড়িতে যাওয়া-আসা করেছেন। মেসোমশাইয়ের বেশ ভালো অবস্থা ছিল। কিন্তু মাসিমাও আজকাল ট্রামে চড়েন। ওতে যাদের প্রেসটিজ নষ্ট হয়, তাদের আসলে কোনো প্রেসটিজই নেই। তুমি কাল নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যেও, পুঁটলি বগলে। চেয়ে পরতে লজ্জা করল না, ফিরিয়ে দিতেই যত লজ্জা!"

"মোটেই চেয়ে পরিনি, দিদি। চাইতে যাব কেন? ও নিজের থেকেই দিল।"

মন্দিরা নীরবে ঘর গুছোয়।

অনিলা বালিশে মাথা গুঁজে কেঁদে বলে, "তুমি আমাকে পেয়ে একটুও খুশি হওনি। সারাদিন খালি দোষ ধর। মাসিমা নিজে কিছু বলেন না, কিন্তু তুমি বল। তুমি কিছু বুঝতে চেষ্টা কর না, কেন

আমি চলে এলাম। তুমি কাউকে ভালোবাস না। আমি যদি মরেও যাই তবু তোমার দুঃখ হবে না।" অনিলা কেঁদে আকুল হয়।

মন্দিরার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। ছোট বোনের মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, "পাগল হয়েছিস। তোকে যতটা ভালোবাসি আর ক'টা লোককেই বা বাসি। প্রকাশ করতে পারি না রে, দিনে-দিনে কী রকম হয়ে যাচ্ছি। তুই এখানে থাকলে হয়তো আবার মানুষের মতো হব।"

ব্রজসুন্দর রাত্রির আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবলে একেই কি গৃহ বলে, উজ্জ্বল আলোয় ভরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর, আসবাবগুলি যত্ন করে ঝাড়া-মোছা, ফুলদানিতে রাখা বাগানের দু-চারটি ফুল, সুশিক্ষিতা কায়দাদুরস্ত চারজন মহিলা।

ব্রজসুন্দরের নিজের বাড়ি যে গৃহ নয়, ইঁট-পাটকেল দিয়ে তৈরি ছোট একটা অট্টালিকা মাত্র, এ-বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই। সেখানে দেহ আরাম পেতে পারে, কিন্তু হৃদয় আশ্রয় পায় না, চিত্ত শান্তি পায় না। বহু বছর আগে মানসনেত্রে দেখা স্তিমিত দীপালোকিত, কপোত-কূজনধ্বনিত, ছায়া-সুশীতল একখানি ছোট স্নেহের নীড়ের কথা মনে পড়ল। তরুণ কল্পনায় রচিত সেই গৃহের শাদাসিধে কিন্তু সুশ্রী আসবাবগুলির কথা মনে পড়ল। আবছায়া এক নারীমূর্তির কথা মনে পড়ল। সে নারী ব্রজসুন্দরের মানসলোকে কোনো দিনও সুস্পষ্ট কায়া ধারণ করেনি। কারণ ব্রজসুন্দর জীবনে কখনো কারো সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধে জড়িত হয়নি।

হায়, হায়, ব্রজসুন্দরের যৌবন চলে গেল কিন্তু সে কোনো মৃগ-নয়না কল্যাণীকে ভালোবাসল না, এ কী করে সম্ভব হল? যে কাব্যলোকে ব্রজসুন্দরের চিত্ত অহরহ বিরাজ করে, যার প্রভাবে তার ওকালতিতে বেশি পসার জমানো হল না, এবং সেই কারণে বিন্দুমাত্র ক্ষোভও জন্মাল না, সেখানে প্রেম চিরদিন সিংহাসনে বসে থাকে। কিন্তু ব্রজসুন্দর প্রেম কাকে বলে জানে না।

ব্রজসুন্দর বাইশ বছর বয়সে লাল বেনারসী-পরিহিতা যে ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করেছিল, তার সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ হবার সুযোগই পায়নি। বৌভাতের পরদিন ব্রজসুন্দরের পিতা সেকালের সেই নামকরা তেজী হরমোহনবাবু নবীনা বধূমাতাকে নির্মমচিত্তে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে এক মাস বাদে ব্রজসুন্দর এম. এ. পরীক্ষাতে পাকা নম্বর রাখে। ব্রজসুন্দরের জানা না থাকলেও, প্রেমের প্রভাব হরমোহনবাবুর যথেষ্ট জানা ছিল। তিনি মনে করতেন যে তাঁর নিজের জীবনের অধিকাংশ বিফলতার ও হতাশার মূলে তাঁর গৃহকর্মে সুনিপুণা, অতিশয় রস-হীনা, গৌরবর্ণা গৃহিণী ছাড়া অপর কেউ নয়।

কিন্তু ভবিতব্যের লিপি কে খণ্ডাবে? ব্রজসুন্দর যদিও ইন্দ্রাণীর প্রেমে পড়েনি, সত্যি কথা বলতে কি ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কারো প্রেমে পড়া প্রায় অসম্ভব ছিল, কারণ তার বয়স ছিল চোদ্দ এবং মেজাজ ছিল চটা, তবুও ঐ বিবাহ ব্যাপারটা নিয়ে ব্রজসুন্দরের মন এতই বিচলিত হয়েছিল, যে পাশ করা দূরে থাকুক তৃতীয় দিন প্রশ্নপত্র বিলি হবার দশ মিনিট পরেই ব্রজসুন্দর মাথা-টাথা ঘুরে বাড়ি চলে এসেছিল।

এর ফলও যেমন প্রত্যাশা করা যেতে পারে ঠিক তেমনি হল। হরমোহনবাবু তাকে যা নয় তাই কটু বাক্য প্রয়োগ করে তাঁর গুরুদেবের সমীপে কিঞ্চিৎ মনের শান্তি আহরণের উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক যাত্রা করলেন, এবং সেই সুযোগে ইন্দ্রাণীও তার পিত্রালয় থেকেই তার ক্ষীণ দেহ ও রুক্ষ মেজাজ নিয়ে নিঃশব্দে একদিন তারালোকে প্রস্থান করল।

বিবাহ থেকে স্থায়ী জিনিস ব্রজসুন্দর লাভ করেছিল একখানি হীরের আংটি, সোনার হাতঘড়ি ও হাতির দাঁতের হাতল দেওয়া একটি ছড়ি। এর কোনোটিই সে আর ব্যবহার করেনি। ব্রজসুন্দরের বিয়ের অধ্যায় বাস্তবিকই শুরু না হতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

ততক্ষণে ব্রজসুন্দর ট্রাম-স্টপ ছাড়িয়ে অন্যমনস্ক হয়ে আরও অনেকটা চলে এসেছে। ভাবল কিছুই করলাম না জীবনে, রবিবারের

আগেই একটা মোটরগাড়ি কিনে ফেলব। দিদির জন্য এতদিন হয়নি। একজন ড্রাইভারও রাখব। নিজে এবং মণিমালা, দুজনেই গাড়ি চালাতে শিখব। কেন পারব না? বাইনোমিয়েল থিওরেম কষতে শিখেছিলাম আর একটা গাড়ি চালাতে পারব না? মণিমালার কথা অবিশ্যি জানি না। বেচারা মণিমালা! ভালোই হয়েছে, ওকে কলেজে ভর্তি করে দেব। এক বছর ক্ষতি হয়েছে, তার আর কী হবে? এবার নিশ্চয় ভর্তি করে দেব। লজিক পড়াতে হবে। মেয়েদের লজিক পড়াই উচিত।

৫

যার অনুগ্রহ লাভ করা যায় সে যে কত বড় শত্রু সে কথা নয়নতারা ও ব্রজসুন্দর দুজনেই উপলব্ধি করল। নিরাশ্রয় নয়নতারাকে ব্রজসুন্দর আশ্রয় দিয়েছিল সেই জন্য নয়নতারা ব্রজসুন্দরকে ক্ষমা করতে পারেন না। নিঃসঙ্গ ব্রজসুন্দরের নির্জন গৃহকে শিশু কলকণ্ঠ দিয়ে নয়নতারা একদা পূর্ণ করেছিলেন, তার সংসারের ভার নিয়েছিলেন, তার বাড়ি-ঘরকে শ্রীহীন হয়ে যেতে দেননি, সেইজন্য নয়নতারাকেও ব্রজসুন্দর সহজে ক্ষমা করতে পারে না।

মাঝে-মাঝে ক্ষুব্ধ চিত্ত যখন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে নয়নতারা কাশী যাত্রার আয়োজন করেন। ছাদের চিলকোঠা থেকে পুরোনো সব ব্যবহারের অনুপযোগী বাক্স-প্যাঁটরা নামিয়ে আনেন। ধুলো ঝেড়ে, তার মধ্যে থেকে কত কী যে সমস্ত পরিত্যক্ত ধনসম্পত্তি আবিষ্কার করেন। মন খারাপ হয়ে যায়। তার উপর কাশীবাসী হতে হলে খরচ লাগে, ব্রজ-সুন্দর কোনো বাধা না দিলেও খরচের কথা উচ্চারণ করে না, আর নয়নতারাকে কেটে ফেললেও তিনি নিজে চাইতে পারেন না, যে পাপিষ্ঠের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে, তার কাছে টাকা চাওয়া যায় কী করে? অবশেষে ছোকরা নেপালী চাকর কাঞ্চা পরিস্থিতিটি পূর্ণ-রূপে উপভোগ করতে-করতে, বাক্স-প্যাঁটরা কাঁধে করে পুনরায় চিলকোঠায় পৌঁছে দিয়ে আসে।

এই সকল আবর্তের মধ্যে নিশ্চিন্ত সুখে ছোট মেয়েটি শশীকলার মতো বাড়তে থাকে। সুরেনের সঙ্গে খিটিমিটি লাগলে তার স্লেচ্ছাচারী আয়া মাঝে-মাঝে ব্রজসুন্দরের কাছে কী দরবার করে; ব্রজসুন্দর অম্লান-

বদনে ও বিবেকবিহীন চিত্তে আয়াকে বলে সুরেন অপরাধী, পরে সুরেনকে বলে আয়া অপরাধী, কিন্তু শান্তিময় অসহযোগ বাঞ্ছনীয়। মণিমালা বিক্ষুব্ধ জলরাশিতে যথাসাধ্য তেল ঢালতে চেষ্টা করে। এর কিছুতেই নয়নতারা যোগ দেন না, কাজেই গৃহে জোড়া-তালি দেওয়া এক প্রকার শান্তি বিরাজ করে।

গৃহে বিরাজ করে কিন্তু ব্রজসুন্দরের মনে করে না। চিরদিন যে আদরে মানুষ হয়েছে, পাঁচজনের সাগ্রহ সমর্থন নিয়ে যার কাজ করা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, তার পক্ষে একাকী দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব। বন্ধুজনের উপর যে কতটুকু নির্ভর করা যায় সে বিষয়ে একদিনেই সে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। বাস্তবিক পৃথিবীতে প্রকৃত বন্ধু পাওয়া দায়, ব্রজসুন্দর এতদিন কেন একথা আবিষ্কার করেনি, তাই ভেবে সে এখন আশ্চর্য হয়ে যায়।

নয়নতারার ভাব দেখে, যারা হিন্দুভাবাপন্ন তাদের উপর থেকে ব্রজসুন্দরের আস্থা চলে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল এ বিষয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেক বেশি উদার। ব্রজসুন্দরের অন্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতীকস্বরূপ যে একজন ছিল, তার নাম অশোক বসু, পেশা ব্যারিস্টারি, বাস আলিপুর অঞ্চল। প্রথমেই ব্রজসুন্দর সৎসাহস ও সহানুভূতিপ্রার্থী হয়ে তার আধুনিক কায়দায় শিরা বের করা কাঠের উপর মোমের পালিশ দেওয়া দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু অন্যদিনের মতো অতিথির আগমনে সন্ত্রস্ত বেয়ারা, কাঁচের টেবিলের সম্মুখে পাতা আরামকেদারায় আসন গ্রহণ করতে আহ্বান করেনি। এমন কি দরজার কাছে কাকেও দেখতে না পেয়ে ব্রজসুন্দরকে নিজেই আসন খুঁজে নিয়ে বসতে হয়েছিল।

মনে-মনে তার কেমন একটি অভিমানও হয়েছিল। এতো এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক হালচাল নয়, এখানে কী আজ সহানুভূতি বা সৎপরামর্শ পাওয়া যাবে? পাঁচ মিনিট লাল-মাছের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবার পর ব্রজসুন্দর দু-তিনবার বেয়ারাকে গলা তুলে ডাকতে বাধ্য হয়েছিল।

তকমাপরা সেই কায়দাদুরস্ত বেয়ারা না এসে, এল এক দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকর। সে ব্রজসুন্দরকে বসতে অনুরোধ করে, ঘরের আলো না জেবলেই, প্রভুর উদ্দশ্যে চলে গেল। তার ঘর্মাক্ত কলেবর, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি থেকে ব্রজসুন্দরের সন্দেহ হল হয়তো বাড়িতে কোনো বিপদ ঘটে থাকবে।

একথা মনে হতেই তার হৃদয় বন্ধুর জন্য ব্যথিত হয়ে উঠল। হেন-কালে অশোক বসু ঘরে ঢুকলেন। কুশল প্রশ্ন করলেন, কোনো বিপদের কথা উত্থাপন করলেন না। আশ্বস্ত হয়ে ব্রজসুন্দর তাঁর বিলিতী হেয়ার-লোসনে সুরভিত কর্ণমূলে নিজের দুর্ভাবনার কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করল। অশোক বসু কতক শুনে কতক না শুনে, পরিশেষে বললেন—"ওসব দায়িত্ব কখনো নিতে হয় ব্রজসুন্দর? নিজের ছেলে-পুলের দায়িত্বই আজকালকার দিনে ব্যাড্‌ এনাফ্‌, তুমি সৌভাগ্য বশত পার পেয়েছ। ফরচুনকে টেম্পট্‌ করা উচিত নয়, পরের মেয়ে ঘাড়ে নিও না, শেষটা ওর লিগেল গার্জিয়ানরা তোমার নামে কেস পর্যন্ত করতে পারে। ঐ মহিলা যে মেয়েটাকে চুরি করে আনেনি তাই বা কী করে জানলে? ওকে পুলিশের জিম্মা করে দাও। তোমার দিদি সেকেলে হতে পারেন কিন্তু তাঁর পরামর্শটা খুব সাউন্ড।"

ব্রজসুন্দরের জেদ চড়ে গেছে। প্রকৃত পক্ষে সে পরামর্শপ্রার্থী নয়, আসলে সে চায় সমর্থন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির বাহবা। সে ক্ষুণ্নমনে তর্কে প্রবৃত্ত হয়। কলেজে পড়বার সময়ে অশোক বসু নিদারুণ তার্কিক বলে নাম কিনেছিলেন। এখন তিনি পাকা ব্যারিস্টার, তাঁর তর্কের উপর সতর্কতার ছোপ লেগেছে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কথা বলেন না। ব্রজসুন্দরের যুক্তির মর্ম হল পুলিশে দিলে ওর অমঙ্গল হবে, আমার বিশ্বাস ওর মা-বাপ ওকে ত্যাগ করেছে, অতএব তোমার বলা উচিত যে আমি ঠিক কাজই করেছি। কিন্তু এ তো হল আবেগের কথা, অশোক বসু কেমন করে সমর্থন করেন?

ব্রজসুন্দর ব্যথিত হয়, অশোকের স্ত্রী কেন আজ এল না, অশোকও

কেমন যেন অন্যমনস্ক। অশোক সে রহস্য উদঘাটন করে—"আজ মাপ কর ভাই, আমি বড় উদ্বিগ্ন, কোনো দিকে মন দিতে পারছি না, আমার কুকুরটা আজ দুপুর থেকে কোথায় যেন পালিয়ে গেছে, বাড়িময় হুলস্থূল কাণ্ড।"

ব্রজসুন্দর প্রশ্ন করাতে জানা গেল যে অশোক বসুর গৃহিণী শয্যা নিয়েছেন, ছেলে-মেয়ে চাকর-বাকর কুকুর খুঁজতে ব্যস্ত, খাওয়া-দাওয়া, বাড়ির কাজকর্ম সব শিকেয় তোলা। ব্রজসুন্দর বিস্মিত হয়, একটা রুক্ষ মেজাজ থ্যাবড়ামুখো কুকুরের জন্য যাদের এত উদ্বেগ, একটি অসহায় মানবশিশুর বেলা তারা কেমন করে এত উদাসীন হয়? গোটা মানব জাতির উপর ব্রজসুন্দরের বিশ্বাস খানিকটা কমে গেল।

মানুষের জীবন এ ধরনের ছোট-ছোট হতাশায় পূর্ণ। ব্রজসুন্দর এর আগে কখনো নিঃসঙ্গ বোধ করেনি, লাইব্রেরিতে, আদালতে, আরাম কেদারায় বই কোলে পরম সুখে তার দিন কেটেছে। নিজেকে বারংবার বলেছে সুখী লোক এই তো কামনা করে, অর্থচিন্তা থেকে মুক্তি, রস-গ্রহণের অবসর, দুচারটি মনের মতো বন্ধু। ভেবেছে আমার বন্ধুভাগ্য বড় ভালো, পুরোনো বন্ধুরাই হল জীবনের সেরা সম্পদ। কারো সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই, ছোটবেলা থেকে কত বন্ধু অর্জন করেছি, কাউকে বিবাদ করে হারাইনি। কয়েকজনকে আমার হৃদয় অতিক্রম করে গেছে বটে, কয়েকজন কালের চক্রে বিনষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু মোটের উপর আমার জীবনটি পরীক্ষা করা পুরোনো বন্ধু দিয়ে পরিপূর্ণ। এরা দাবী করে না, এরা আত্মীয়স্বজনের চেয়ে ভালো, এরা আমার স্বনির্বাচিত, এরা ঘাড়ে-চাপানো নয়। আমি কি সুখী!

ব্রজসুন্দরের যে নারীবন্ধু নেই, একথাও সত্য নয়। ব্রজসুন্দরের জীবন বান্ধবীশূন্য নয়। ব্রজসুন্দর শিক্ষিত মেয়েদের সঙ্গে মেশেনি, হেমনলিনী দেবীর এ সন্দেহ অমূলক। শ্রীমতী অরুণলেখা মুখার্জি ব্রজসুন্দরের বহু দিনকার বান্ধবী। এম-এ পাশ করে, বিপত্নীক হয়ে

ব্রজসুন্দর যখন বিলেত গিয়েছিল, সেইখানে সেই সময়ে অরুণলেখা দেবীর সঙ্গে তার পরিচয়, তাঁর স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব। সে বন্ধুত্ব এখনো অটুট আছে। মিস্টার মুখার্জি রাশি-রাশি বিজনেস ডীলের নিচে চাপা পড়াতে সব সময়ে ব্রজসুন্দরের দৃষ্টিগোচর হন না, কিন্তু অরুণলেখা দেবীর অবারিত গৃহে ব্রজসুন্দর চিরদিন সমান আদর পেয়ে এসেছে।

কত সময়ে ব্রজসুন্দর ভেবেছে এদের সঙ্গে আমার মনের মিল আছে, আমরা সাহিত্য ভালোবাসি, শিল্প ভালোবাসি, এক ধরনের ভাষা ব্যবহার করি, একই ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করে তর্ক করি। এরা আমার প্রকৃত বন্ধু। কিছুদিন ধরে মনে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে ব্রজসুন্দর সান্ত্বনার জন্য অরুণলেখার বাড়িও গিয়েছিল।

ভেবেছিল অরুণলেখা লাফিয়ে উঠে কোমরে নীল শাড়ি জড়িয়ে বলবে : সাবাস ব্রজসুন্দর, এই তো পুরুষমানুষের মতো কাজ! কিন্তু কই, তাতো হল না। সূর্যাস্তের স্তিমিত আলোয় তাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ব্রজসুন্দর দেখলে বাড়ির সামনে ফুল বাগানে শীতের ফুলের বাহার, চওড়া চাতালে ফিকে সবুজ বেতের চেয়ারে ঘোর সবুজ কুসন পাতা, নিচু কাঁচের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। এই পরিবেশই ব্রজসুন্দরের হৃদয় অন্বেষণ করছিল, মনে হল পাখি যেন কুলায় ফিরে এসেছে।

অরুণলেখা মুখ তুলে ব্রজসুন্দরকে বললে, "এতদিন পরে বুঝি মনে পড়ল আমাদের?"

মিস্টার মুখার্জি হাতের সিগার নামিয়ে বললেন, "বস ব্রজসুন্দর, আমাদের আজ কী সৌভাগ্য!"

এই মামুলি কথাগুলি তাকে আঘাত করে, ব্রজসুন্দর ভাবে এখুনি আমার ভাবনাচিন্তার কথা শুনলে ওরা নরম হয়ে আমাকে সহানুভূতি জানাবে, এখন কোনো কারণে হয়তো ক্ষুব্ধ হয়ে আছে।

ব্রজসুন্দরের উপাখ্যান শুনে অরুণলেখা বলে, "তুমি একটি হোপলেস্ রোমান্টিক!"

মিস্টার মুখার্জি বলেন, "মাই ডিয়ার ব্রজসুন্দর, তুমি একটি আস্ত পাগল। ও মেয়ে নিয়ে তুমি কী করবে? ওর প্রতি তোমার কোনো টান নেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ওর ভার নিয়ে তুমি কোনো আনন্দ পাচ্ছ না। কেন জীবনটাকে রাবিশ দিয়ে ক্লাটার করবে? ওকে একটা হোম-টোমে দিয়ে দাও। জানো তো মনের শান্তির মতো পৃথিবীতে আর কিছু নেই। কোথায় নিরিবিলি সাহিত্যালোচনা করবে, না কোথায় ফিডিং বটল, কোথায় গ্রাইপ ওয়াটার করে বেড়াতে হবে। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে এসব ঝামেলাকে প্রশ্রয় দিলে এগুলোই তোমার জীবনটাকে অধিকার করে বসবে, তোমার সব সুখশান্তি নষ্ট করে দেবে।"

মিস্টার মুখার্জির সিগারের আগুন এইখানে নিভে যাওয়াতে তাঁকে থামতে হল। ব্রজসুন্দর বললে, "তাহলে তোমাদের মতে ভাবনার অভাবই হল সুখ, ঝামেলার অভাবই হল শান্তি? তা তো নাও হতে পারে।"

অরুণলেখা চাদানির কারুকার্য-করা ঢাকনি খুলে ব্রজসুন্দরকে এক পেয়ালা সুবাসিত দার্জিলিং চা পরিবেশন করে বললে, "এটা খেয়ে ফেলে একটু ঠান্ডা হয়ে বস তো দেখি, এক্ষুনি সুস্থ বোধ করবে, আর ওরকম মনে হবে না। বরং আমাদের দুঃখের কথা শোনো। তোমার বুক ফেটে যাবে। ভাবতে পার আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ডলি আমার বাবুর্চিকে ভাগিয়ে নিয়েছে? আর আমাদের জীবনে বাকি রইল কী? তবু তুমি নিজের কথাই কেবল ভাবছ। তোমার সমস্যা কি আবার একটা সমস্যা নাকি? হয় মেয়েটাকে রাখবে, দিদিকে কাশী পাঠাবে; নচেৎ দিদিকে রাখবে মেয়েটাকে হোমে পাঠাবে। কিম্বা দুজনকেই বাড়িতে রেখে নিজে গিয়ে হোটেলে বাস করবে। এ আবার একটা সমস্যা নাকি? কিন্তু আমাদের কথা ভাব তো। সারা পৃথিবী ঘুরলেও অমন একটি বাবুর্চি পাব না। ডলি তাকে কিছুতেই ছাড়বে না, তার মাইনে ডবল করে দেবে, তাকে

শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবে। সে আমার বেষ্ট ফ্রেন্ড হতে পারে, কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য কী না করতে পারে।"

মিস্টার মুখার্জি একটু কাষ্ঠ হেসে বললেন, "এখানে একদিন খেয়ে গিয়ে অবধি সাত মাস ধরে নানান ফন্দী করে শেষটা সত্যি-সত্যি ভাগিয়ে নিল। তারপর বুকের পাটা কতখানি শোনো আবার আমাদেরই নেমন্তন্ন করে আমাদের বাবুর্চির রান্না খাওয়াল।"

অরুণলেখা বললে, "আর আমাকে বললে ডার্লিং, তোমরা নিশ্চয় ওকে মিস করছ। আমি আর যাই হই, স্বার্থপর নই। যখন ইচ্ছে হবে, যতবার ইচ্ছে হবে, এখানে এসে খেয়ে যাবে। খালি আমাকে একটু জানিয়ে দিলেই হল।"

তারপর দুজনে সমস্বরে বললেন, "দেখতেই পাচ্ছ। সেই অবধি আমাদের জীবন মরুভূমি হয়ে গেছে। তোমার সমস্যার কথা শুনে আমাদের হাসি পাচ্ছে।"

সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে ব্রজসুন্দরের মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। একবার ভাবল ঐ ডলির কাছে যাই, তার অন্তরে নিশ্চয় সুখ-শান্তি আছে কারণ তার রান্নাঘরে অমন বাবুর্চি বিরাজ করছে, সে নিশ্চয় বন্ধুজনকে দুটো ভালো কথা বলবে। কিন্তু ডলির বাড়িতে রোজই নাকি পার্টি থাকে, অরুণলেখা বললে। আরও বললে, "গেলেও পার, কথা বলবার ফুরসুত হবে না, তোমাকে হয়তো দেখেও দেখতে পাবে না, কিন্তু ভালো খেতে দেবে। আগের মতো নয়। তখন মিনার কেবিন থেকে পরটা কাবাব কিনে এনে পাইরেক্স বাসনে সাজিয়ে বাড়ির রান্না বলে চালাত। গরম করে পর্যন্ত দিত না।"

ব্রজসুন্দর বিস্মিত হয়। নারীহৃদয় কে কবে বুঝতে পেরেছে? এ তো সেই হেরিকের কাব্য আলোচনা করা পরিচিত অরুণলেখা নয়। এ বাবুর্চিহারা ক্ষুধা নারীকে ব্রজসুন্দর কখনো দেখেছে বলে তার মনে পড়ে না। ভাবে, কী আশ্চর্য! সংসারটি তেল দেওয়া যন্ত্রের মতো

না চললে সেখানে সাহিত্য বা শান্তি বা সন্তুষ্টি কিছুই স্থান পায় না।

বারংবার মন্দিরার কথা মনে হয়। তার শান্ত মুখে তিক্ততার আভাস ব্রজসুন্দরের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, তার মনটি কেমনতর কে বা জানে। সংসারের ছোট ছোট হতাশা তাকেও বিচলিত করে কিনা তাই বা কে জানে। ব্রজসুন্দরের নিজের সংসারের বৃহৎ হতাশার কথা মনে পড়ে যায়। কী আশ্চর্য, জীবন যে এত হতাশায় ভরা ব্রজসুন্দর একথা আগে সন্দেহও করেনি। ছোট একরত্তি মেয়েকে একটুখানি আশ্রয় দিয়েছে, আর তক্ষুনি কাঁচের বাড়ির মতো তার শান্তির পুরোনো প্রাসাদখানি ধূলিসাৎ হয়ে গেল!

ব্রজসুন্দর চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। নয়নতারা অভ্যাসমতো জানলায় অপেক্ষা করে নেই। কেউ শুধোয় না কোথায় গিয়েছিলে, কে তোমাকে কী বলল, দেরি করলে কেন। যুক্তিহীন ভাবে নয়নতারার বিরক্তির কথা ভুলে গিয়ে, ব্রজসুন্দর ভাবে আমি কী করি কোথায় যাই তাতে কারো কিছু এসে যায় না। আমার সুখদুঃখের ভাগীদার নেই কেউ।

মণিমালা নিঃশব্দে এসে জিগগেস করে, "খাবার দিতে বলি?"

ব্রজসুন্দর অকারণে বিরক্ত হয়, বলে, "তুমিও খাওনি?"

মণিমালার চোখের কোণে অশ্রু জমা হয়, ব্রজসুন্দর তাই দেখে আবার অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, "শরীরটার অযত্ন করলে চলবে না তো মণিমালা। গ্রীষ্মের ছুটির পর তোমাকে কলেজে ভর্তি করে দেব। তুমি লজিক পড়বে। এরকমভাবে তোমার জীবন নষ্ট হতে দেব না। বিয়েটিয়ে কিছু নয়। আমি বিয়ে করে দেখেছি ওতে কিছু নেই। তার চেয়ে পড়াশুনো কর।"

মণিমালা আহ্লাদে আটখানা হয়ে, আগেকার মতো উদ্ভাসিত মুখে মামার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলে, "সত্যি ভর্তি করে দেবে? দেখ,

আমি কত যত্ন করে পড়াশুনা করব। তুমি নিশ্চয় খুশি হবে। মা বাধা দেবেন না তো?"

ব্রজসুন্দর সগর্বে বলে, "মা'র বাধার কোনো মানেই হয় না। আমি বলছি তুমি কলেজে পড়বে।"

নিচের ঘরখানিকে ঝেড়ে মুছে, পর্দা টানিয়ে দু-এক খানি পুরোনো আসবাব নামিয়ে এনে, মণিমালা মামার জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছে। মণিমালার ইচ্ছা করে মামা একবার খুকুকে দেখে আসুক। আজ বিকেলে মণিমালা খুকুর দুগাছি রেশমি চুল নীল রিবন দিয়ে ঝুঁটি করে বেঁধে দিয়েছে, আয়া খাটের পাশে নিচু মোড়ায় বসে সোয়েটার বুনছে। চার-দিকে কী শান্তি বিরাজ করছে, মামা একবার দেখে এলে হত। এত তাগাদা কিসের মণিমালার আনাড়ি রসনা সেকথা গুছিয়ে বলতে পারে না, তবু সাহস করে বলে ফেলে, "মামাবাবু, চল না খুকুকে দেখে আসবে।"

"কেন রে, সে ঘুমোয়নি? ভালো আছে তো?"

মণিমালা বুঝিয়ে বলে সে ঘুমোচ্ছে এবং ভালো আছে, তবু দেখে এলে বেশ হয়।

দুজনে গিয়ে খুকুকে দেখে আসে। শুভ্র শয্যায় যেন আলগোছে রাখা একছড়া ফুল। ব্রজসুন্দরের মন হাল্কা হয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে বলে, "ওর কী নাম রাখা যায় বল্ তো?"

মণিমালা অকূল পাথারে পড়ে যায়। রেবা, শিপ্রা, শীলা। নীলা, মালা। শ্যামলী, কেতকী, হৈমন্তী। কোনোটাই মনে ধরে না। অবশেষে মণিমালা বলে, "পাশের বাড়ি থেকে মা'র বন্ধু মণিকা-মাসিমা এসে-ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর এক বন্ধুর মেয়ে এসেছিল। সে একটা-দুটো নাম বলেছিল।"

ব্রজসুন্দর চকিত হয়ে ওঠে। কে বন্ধুর মেয়ে? মণিমালা আরও বলে ঐ মেয়েটি কি সুন্দর দেখতে, ওর নাম অনিলা। ও বলছিল খুকুকে

বেশি দিন খুকু বললে, চুলপাকা বুড়ি হয়ে গেলেও খুকু নাম ঘুচবে না, তাই এখনই নাকি ধুমধাম করে ওর একটা নামকরণ করা উচিত। বলছিল মঞ্জুশ্রী, কী জয়তী নাম বেশ ভালো।

ব্রজসুন্দর অন্যমনস্কভাবে বললে, "না, ওর নাম হোক নন্দিনী, নামটা কানে শুনতে বেশ মিষ্টি লাগে।"

খেতে বসে মণিমালা আবার নামকরণের কথা উত্থাপন করে : "নাম-করণ করলে বেশ হয়, না মামাবাবু? আমাদের বাড়িতে কখনো কিছু হয় না। তোমার কোর্টের বন্ধুরা যখন আসেন, মা চা জলখাবার করে দেন, বলেন ওকেই নাকি আতিথ্য বলে। ডাকবার কোনো দরকার করে না, যে আপনা থেকে আসবে তাকেই আদর করতে হয়। আমার কিন্তু ইচ্ছে করে আমাদের বাড়িতে একটা কোনো উপলক্ষ্য করে বেশ আমোদ-আহ্লাদ হোক, লোকজনকে নেমন্তন্ন করা যাক, ঘর-দোর সাজানো যাক, গান-টান হোক, খাওয়া-দাওয়া হোক। এমন কক্ষনো হয় না আমাদের বাড়িতে।"

ব্রজসুন্দরেরও সহসা উৎসাহ হয়। "দেখ মণিমালা, নামকরণ বলে কোনো অনুষ্ঠান করে কাজ নেই। এমনি একদিন লোকজন ডাকলে হয়। তবে তোর মা হয়তো যোগই দেবে না। তুই পারবি তো? সুরেন খুব ওস্তাদ আছে, আর রাঁধবার লোকটাও তো ভালো। তাছাড়া বাইরে থেকে অর্ডার দিয়ে ভালো জিনিস আনা যায়। পারবি তো?"

মণিমালা মাথা নেড়ে বলে, "কেন পারব না, মণিকা-মাসিমাকে ধরে আনব, উনি ফ্যাসানেব্‌ল্‌ মানুষ, অনিলাদিকেও আসতে বলব, তিনজনে মিলে খুব পারব।"

দুজনে তখন নানান জল্পনায় মত্ত হয়ে যায়। শুতে যেতে দেরি হয়। নিজের ঘর থেকে নয়নতারা তাদের কণ্ঠস্বর শুনে ভাবেন, "কী পাষাণ প্রাণ ওদের! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আর ওরা হাসতে, গল্প করতে পারছে?"

উৎসবের আয়োজন ধীরে-ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। ব্রজসুন্দর সহসা একদিন মণিমালার জন্য একখানি সমুদ্রবক্ষের মতো ঈষৎ সবুজের আভা লাগা নীল রেশমী শাড়ি কিনে আনে। "তোকে আমি নিজে পছন্দ করে কখনো শাড়ি কিনে দিইনি। এটা সেদিন পরিস। আর দেখ, তোর মণিকা-মাসিমাকে ধরে এর সঙ্গে ম্যাচ করা জামাটাও কিনে আনিস।"

মনে পড়ে বিয়ের পর একখানি গোলাপী শাড়ি কিনেছিল তার নব-বধূর জন্য। বাবার ভয়ে বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল। দুঃখের বিষয় ইন্দ্রাণীর সেটি পছন্দ হয়নি, কাকে যেন দিয়ে দিয়েছিল। ব্রজসুন্দর আর কখনো কারো জন্য পছন্দ করে শাড়ি কেনেনি। কেনা-কাটার ভার নয়নতারা চিরদিন নিজের হাতেই রেখেছিলেন।

নন্দিনীর জন্যেও শাদা রেশমী জামা কেনা হয়। মণিমালা তাতে অনভ্যস্ত হাতে ছোট-ছোট গোলাপী ফুল তুলে দেয়। গোলাপী রিবন কিনে আনে।

অতিথিদের ফর্দ করতে গিয়ে তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে। "আত্মীয়স্বজন নয় মামাবাবু, বন্ধুবান্ধবদের বলা হবে। তুমি কি বলতে চাও তোমার-আমার দুজনের মিলিয়ে পঞ্চাশজন বন্ধু নেই? আমার সঙ্গে পাশ করেছে যারা, তাদের দুচারজনের সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল, তাদের বলা যায়। তোমারও তো বন্ধুবান্ধব আছে।"

মণিমালা ভেবেচিন্তে তালিকা প্রস্তুত করে। অরুণলেখাদের বলতে হয়, অশোক বসুদের বলতে হয়, অনিলা এসে যখন কাজ করবে তখন তাদের বাড়ির সকলকেও বলতে হয়। ধীরে ধীরে তালিকা দীর্ঘ হয়। নতুন পর্দা সেলাই হয়, পুরোনো ফুলদানি মাজাঘষা হয়, ব্রজসুন্দরের বাপের আমলের রুপোর বাসন দিনের আলোর মুখ দেখে, রাশি-রাশি কাঁচের ও চীনে মাটির বাসনেরও ব্যবস্থা হয়।

নয়নতারা রাগ করে ছোট একখানি সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে এক-

৮ মাসের জন্য মাস্তুতোবোনের বাড়ি বৈদ্যনাথে চলে যান। মণিমালা একটু কেঁদে নিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তাঁর চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যেন বাড়িতে একটা নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে। শীত শেষ হয়ে এসেছে, নন্দিনী আর খাটে শুয়ে থাকে না, বৈঠকখানার মেঝেতে গালচের উপর গড়াগড়ি দেয়।

নিমন্ত্রণপত্র বিলি হয়।

হেমনলিনী দেবী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না।

"পাগল হয়েছ অনিলা? সমাজে বাস করতে হলে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। যারা সেগুলি মেনে চলে না, তাদের কোনোমতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। সমাজে যার অধিকার নেই, জোর করে তাকে সমাজে স্থান দিলেই তো আর হল না। ছোট শিশু তার দোষ না থাকতে পারে, না হয় তাকে আশ্রয় দেওয়া গেল, কিন্তু তাকে উপলক্ষ্য করে একটা অনুষ্ঠান করার কোনো মানেই হয় না।"

অনিলা হতাশ হয়ে বলে, "চিঠিতে তো কোনো অনুষ্ঠানের কথা নেই মাসিমা।"

"চিঠিতে না থাকতে পারে কিন্তু তুমি তো নিজের মুখেই বলেছ আসলে খুকুর জন্য লোক ডাকা হচ্ছে। ব্রজসুন্দরের দিদি মনের দুঃখে চলে গেল, আর তোমরা সে বাড়িতে আমোদ করতে যাবে? বাড়ির লোকে যেটা বরদাস্ত করতে পারছে না, তোমরা সেটা বরদাস্ত করবে? হিন্দু-সমাজে যে ব্যবহার চলবে না, তোমরা তাকে সমর্থন করবে? আত্মসম্মান বলে একটা জিনিস নেই?"

মন্দিরা কোনো আলোচনায় যোগ দেয় না। তার মনের কথা কেউ জানতে পারে না। ঘরে এসে অনিলা রাগ করে বলে, "মাসিমার মন বড় সঙ্কীর্ণ। মিলিরা এর চেয়ে কত উদার। হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা উদারতা আছে। ওরা সকলের সঙ্গে মেশে, সব জায়গায় যায়, সব কিছু খায়। অন্য লোকদের ব্যক্তিগত জীবনে ইণ্টারফিয়ার করে না। বাইরের

ব্যবহার দিয়ে কথা, সেটা ভালো হলেই হল। কত রকম লোক ওদের পার্টিতে আসে শুনেছি।"

মন্দিরা বললে, "কই, সকলের সঙ্গে মেশে না তো। গরীবদের সঙ্গে মেশে না। সুনীতির ধার ধারে না বটে, তবে অর্থনীতির ধার ধারে। মোটেই সব জায়গায় যায় না, কেবল ফ্যাসানেব্‌ল্ জায়গায় যায়। একই রকম, কেবল লেবেলগুলি পালটানো।"

অনিলা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। "দিদি, কী তীক্ষ্ণ-তীক্ষ্ণ কথা বল তুমি! মিলিদের তুমি একটুও বোঝ না, কেমন হাসি-খুশিতে ওদের জীবন ভরা।"

"ওর স্বামীর টাকা কমে গেলে ওর হাসিখুশিতেও ঘাটতি পড়ত অনিলা।"

"তুমি কি সত্যি মাসিমাকে সাপোর্ট কর? তোমাতে আমাতে কত তফাত! মণিমালা আমার উপর নির্ভর করে আছে লিখেছে। মণিকা-মাসিমা আর আমি গিয়ে ওদের সাহায্য করব আশা করে আছে। ওদের বাড়িতে নাকি কখনো পার্টি হয়নি, কী করতে হবে তাই ঠিক জানে না। মণিকা-মাসিমা একা পারবেন কেন?"

"তোমার কোনো ভয় নেই অনিলা। মণিকা-মাসিমা ওদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না। ওঁরও মাসিমার মতো সব প্রিন্সিপল আছে।"

অনিলার চোখে জল আসে, "আমি কেন যাব না, আমার তো কোনো প্রিন্সিপল নেই। আমার যাওয়া বন্ধ করবার মাসিমার কী অধিকার আছে?"

"অধিকার আছে বৈকি, অনিলা। তুমি তাঁর বাড়িতে যখন আশ্রয় নিয়েছ, তাঁর মতামত মেনে চলা তোমার কর্তব্য বৈকি।"

"তুমি বুড়ো হয়ে গেছ দিদি। তোমার প্রাণ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তুমি খালি বোঝ কাজ আর কর্তব্য।"

মন্দিরা নীরবে চুল বেঁধে শোবার আয়োজন করে।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৬ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

এর মধ্যে কোন সুযোগে অনিলা একদিন প্রতিবেশী দু-চারজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে এল। মন্দিরা অফিস থেকে ফিরে সে কথা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে বললে, "কেন গেলে অনিলা? মাসিমা যেখানে যান না, সেখানে তোমারও যাওয়া উচিত হয় না।"

"কেন উচিত হয় না? মাসিমা তো বুড়ো হয়ে গেছেন, উনি যা করবেন আমাকেও তাই করতে হবে? তাছাড়া বাবাই তো বলেন যে পাড়ার লোকের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে হয়, নইলে তারা বিপদে আপদে সাহায্য করবে কেন। এত বছর এখানে আছ, পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছেও করেনি, দিদি?"

মন্দিরা হাতমুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছতে-মুছতে বলে, "মাসিমা যেটা পছন্দ করেন না জানি, সেটা করতে ইচ্ছে হয় না আমার।"

"ইস! বললেই হল কিনা! মাসিমা তো ব্রজসুন্দরের এখানে আসা পছন্দ করেন না; আর তুমি তাকে দস্তুরমতো আস্কারা দাও। তুমি যদি আমার পাড়াবেড়ানোর কথা মাসিমাকে বলে দাও, আমিও ব্রজসুন্দরের কথা বলে দেব।"

আহত হয়ে মন্দিরা অনিলার দিকে চায়, বলে, "তোমাকে বলতে হবে না অনিলা, আমিই বলব।"

অনিলা ছুটে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "রাগ করলে দিদি? আমাকে মারো, আমাকে বক, ওরকম করে তাকিও না।"

হায় মন্দিরা কেন কারো গলা জড়িয়ে কাঁদতে পারে না, মনের জমানো কথাগুলি কেন ভাষায় গুছিয়ে বলতে পারে না?

অনিলার কপালে চুমো খেয়ে মন্দিরা বলে, "পাগল হলি নাকি? চল, চা খাই গিয়ে, খিদে পেয়েছে।"

একখানি পুরু নীল খামে মিলির বাড়ির পার্টির নিমন্ত্রণ আসে। মিলি মন্দিরাকেও বলেছে। অনিলা আনন্দে আটখানা হয়। "মাসিমা, আমরা দুজনে যাব তাহলে তোমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। দিদি, বল এবার খুশি হয়েছ।"

মাসিমা চিন্তিত হন। "অনেক রাত হয়ে যাবে যে মন্দিরা, কী করে ফিরবে?"

মন্দিরা বুঝিয়ে বলে রাত বেশি হবার আগে চলে এলেই হবে। দশটার মধ্যে এলে ট্রাম বাস চলবে। অনিলা অবাক হয়ে বলে, "ট্রাম বাস কী দিদি! ছি! না, ওদের পার্টিতে কেউ ট্রাম বাসে যায় না, নিদেন একটা ট্যাক্সি করতে হবে। সব থেকে ভালো হয় যদি কারো গাড়িতে লিফট পাওয়া যায়।"

কিন্তু মন্দিরা বেঁকে বসে, কারো গাড়ি চড়ে যাওয়া হবে না বরং ন্যাপলাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে গেলেই হবে। সে গেটের বাইরে বসে থাকবে, রাত্রে তার হেফাজতে ট্যাক্সি করে আসা যাবে। মনের মতো না হলেও মাসিমা রাজী হয়ে যান। অনিলাকে তার চান্স দেওয়া দরকার বৈকি। মিলির বাড়িতে তার গান গাইবার কথা, কলকাতার সমাজে তার পদার্পণের এই বেশ সুযোগ। ভবিষ্যতে ওর বিয়ে-থার কথাও তো ভাবতে হবে। সকলে তো আর মন্দিরা অথবা বুড়ি মাসিমার মতো নয়। মন্দিরা নীরব থাকে।

"দিদি তুমি কী পরে যাবে? আর আমিই বা কী পরব? তোমার ঐ সব পুরোনো সেকেলে প্যাটার্নের শাড়ি আমার একটুও পছন্দ নয়। কী হবে মাসিমা?"

মাসিমা হেসে বলেন, "না হয় তোমাকে একখানি শাড়ি কিনেই দেব, কোনো দিন তো আর বিশেষ কিছু দিইনি তোমাকে। তুমি সন্ধ্যেবেলা

ওকে নিয়ে একটু বেরিও মন্দিরা, ওর পছন্দমতো কাপড় কিনে দিও।"

অনিলার সমস্যা ভঞ্জন হয়। শাড়ি কেনা হবে, কী শাড়ি কেনা হবে, সেই সঙ্গে নতুন জামাও হবে কিনা, সব কথাই স্থির হয়ে যায়। তারপর মন্দিরা মুখ তুলে হঠাৎ বলে, "তোমাকে বলা হয়নি মাসিমা, তুমি যেদিন মণিকা-মাসিমার বাড়ি চা খেতে গেলে সেদিন ব্রজসুন্দরবাবু এসেছিলেন, ঘণ্টাখানেক গল্প করে গেলেন, তোমাকে তাঁর নমস্কার জানাতে বলেছিলেন।"

মাসিমার মুখ অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এখানে তার কী প্রয়োজন, কেন সে আসে? বাড়িতে নিজের বিধবা দিদির তো আর দুঃখের অন্ত নেই। মণিকার বাড়ি থেকে মাসিমা শুনে এসেছেন যে বেচারী দিদি আর সইতে না পেরে ভাগলপুর না কোথায় যেন তাঁর শ্বশুরবাড়ি, সেখানে চলে যাচ্ছেন। এ-সব লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়।

মন্দিরা এত কথার কোনো উত্তর দিল না দেখে, অনিলা অস্ত্র ধারণ করে, "ভালোই তো শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। বহুদিন তো ভাই বেচারাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছেন। শ্বশুরবাড়িতেই তো যাওয়া উচিত। আর ব্রজসুন্দরবাবু বাড়িতে এলে দিদি কি তাঁকে মেরে তাড়িয়ে দেবে? এর পরের বার এলে তোমাকে ডেকে দেব মাসিমা, তুমি ওঁকে ভাগিও। উনি এত ভালো দেখতে যে আমি কিছু বলতে পারব না, কালো-কুচ্ছিত হলে বরং পারতাম।"

হাসিমুখে অনিলা মাসিমার দিকে চেয়ে থাকে। মন্দিরা বিরক্তিপূর্ণ-কণ্ঠে বলে, "তোমার তো কিছু বলবার প্রয়োজন ছিল না, অনিলা। মাসিমা তোমাকে তো কিছু বলেননি।"

মাসিমাও ব্যস্ত হয়ে বলেন, "কি মুশকিল, আমি কাউকে কিছু বলিনি। মন্দিরা চিরকাল বিবেচনা করেই কাজ করে থাকে, আর এখন তো যথেষ্ট বয়েসও হয়ে গেছে। তাকেও কিছু বলিনি, তোমাকেও কিছু বলিনি। এখন ওঠ, তৈরি হয়ে নিয়ে দুজনে কাপড় কিনতে যাও।"

এমনি করে দিন যায়। মিলির পার্টির দিন এসে পড়ে। অনিলার নীল সিফনের শাড়ি হয়, রেশমি জামা হয়। মিলি একদিন নিজে এসে গানের কথা বলে যায়। "তোর যা ইচ্ছে গাইবি অনিলা, কিন্তু আধঘণ্টা নাগাদ গাইবি, আমি বাজনার ব্যবস্থা করব, সেকেলে গান করিস না তাই বলে। আর দেখ খুব সেজে যাবি কিন্তু, অনেক ইয়ংম্যান আসবে, তোর ঐ রূপ দেখে আর গলা শুনে সব যেন মুগ্ধ হয়, তুই তো আর মন্দিরাদির মতো ওল্ড মেড্ হতে চাস না।"

মন্দিরাও হেসে বলে, "বেশি নিশ্চিন্ত হয়ো না কিন্তু মিলি, আমার সম্বন্ধে। হঠাৎ একটা লাগিয়ে দেব শেষ পর্যন্ত।"

মিলি চলে গেলে অনিলা দিদিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "ঠাট্টা নয় দিদি, এখনো তুমি ভালো করে সাজো যদি, অনেকের চেয়ে তুমি ঢের ভালো দেখতে, খুব ভালো বিয়ে হতে পারে তোমার। শঙ্করটা একটা লক্ষ্মীছাড়া, তার জন্য তুমি কি চিরদিন আইবুড়ো থাকবে?"

মন্দিরা তবু একটু হেসে বলে, "কতদিন বলেছি তোমাকে শঙ্করের কথা আমার মন থেকে মুছে গেছে। তখন অবিশ্যি খুব দুঃখ হয়েছিল; কিন্তু তারপর সাত-আট বছর কেটে গেছে, মনে সে দুঃখের লেশমাত্র আর নেই। চল কোন গান গাইবে ঠিক করা যাক।"

শেষ পর্যন্ত মন্দিরার পরামর্শ অনুসারে রবীন্দ্র-সঙ্গীত নির্বাচন করা হয়। "ও কখনো পুরোনো হয় না, অনিলা। এগুলি দেখ, বেশ হাল্কা ধরনের কিন্তু কি মিষ্টি।" রোজ সন্ধেবেলা বাড়িতে গানের আসর বসে। প্রায়ই মণিকা-মাসিমা আসেন। বলেন, "তোমাদের বাড়িটা আজকাল বেশ, হাসিতে-খুশিতে ভরপুর, বাড়িতে মন খারাপ লাগলেই চলে আসি। খাসা গলা তোমার অনিলা, এমন গলা ভগবানের দান, এর জন্য গর্ব করতে হয় না, কিন্তু যত্ন করতে হয়। মন্দিরা, তোমার ছোট বোনটি শুধু সুন্দরী নয়, একটি জীনিয়াসও বটে। রূপ তো দুদিনের জিনিস।" তারপর বিনীতভাবে বলেন, "রূপ একদিন আমারই কী ছিল

না, এখনো আমার চুল দেখ, গায়ের রঙ দেখ, তবে সুন্দরী আর নই। এখন লোকে আমাকে খাতির করে যে কাজ করেছি শুধু তারই জন্য।"

মণিকা-মাসিমাকে অনিলার শাড়ি জামা দেখানো হয়, মাসিমা উৎসাহিত হয়ে তার সঙ্গে রঙ মানিয়ে একছড়া ছোট-ছোট নীলা বসানো সোনার হার অনিলাকে উপহার দেন। "তুমি নাও অনিলা, আমার তো গয়না পরার দিন চলে গেছে, ছেলেমেয়েও নেই, দেব আর কাকে? মন্দিরা তো সন্ন্যাসিনী বললেও হয়।"

মন্দিরা বলে, "মোটেই সন্ন্যাসিনী নই, মাসিমা। ওসব ছোট জিনিস নয়, একছড়া গজমতির মালা দিয়ে দেখ না কতখানি সন্ন্যাসিনী!"

অনিলা বারবার জিগগেস করে, "দিদি, তুমি কী পরে যাবে সেদিন? যা-তা পরলে চলবে না বলে রাখলাম।"

"না রে না, আমার খুব ভালো শাদা দক্ষিণী শাড়ি আছে, মাসিমার আলমারিতে তোলা। সেজে যাব বৈকি। দেখিস তোকে সুদ্ধ না সেদিন কাট্ আউট্ করে দিই।"

অনিলা বললে, "দেখ দিদি, তুমি কেন মাসিমাকে বললে সাতটায় যাবে? সাতটায় বললে সাতটাতেই যেতে হয় না, সাড়ে-সাতটার আগে তো নয়ই। পাটনায় যখন মিলিরা থাকত, ওদের বাড়িতে মাঝে-মাঝে পার্টি হত। মানে মিলির বাবার বাড়িতে, ওর বিয়ের আগে। ঐরকম করেই তো ভদ্রলোককে শেষ অবধি পাকড়াল। স্রেফ খাইয়ে-খাইয়ে ঘায়েল করল। মাসিমারও উচিত, হপ্তায়-হপ্তায় পার্টি দেওয়া, ইয়ং-ম্যানদের ডাকা।" তারপর একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, "তাই করতে হয়, নয়তো বেশ ভালো দেখে পাত্র খুঁজে বিয়ে দিতে হয়।"

মন্দিরার হাসি পায়, "হ্যাঁরে, তুই না গান শিখে একটা কেরিয়ার করবি? এখনই যে বড় বিয়ে-বিয়ে করছিস?"

অনিলা আড়চোখে দিদির দিকে চেয়ে বলে, "আহা, শুধু কি আমার জন্য বলছি। তাছাড়া যা হবে না সে কথা বলেই বা কি লাভ?"

মিলির বাড়িতে উৎসবের আয়োজনে কোনো ত্রুটি হয়নি। সাড়ে-সাতটার সময়ে মন্দিরা আর অনিলা উৎসব প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিল। মিলির বাগানে গাছে-গাছে চীনে লণ্ঠন দুলছিল, বসবারঘর ফুলের সম্ভারে সুন্দর হয়েছিল, সেখানে নীল শাড়ি পরিহিতা সুন্দরী অনিলার রূপে ও সুকণ্ঠে সকলে মুগ্ধ হয়েছিল। মন্দিরার মনও আনন্দে ভরে গিয়েছিল। ভেবেছিল আমি দর্শকমাত্র, এসবে আমার প্রকৃত কোনো স্থান নেই। এরা সকলে তার অপরিচিত, এদের কথা-বলার ভঙ্গী স্বতন্ত্র, এদের চিন্তাধারা বিভিন্ন। মন্দিরার চিত্ত দর্শকের নৈর্ব্যক্তিক আনন্দে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কী আশ্চর্য অনিলাও এদের চেনে না, কিন্তু কী সহজে নিজের স্থানটি করে নিয়েছে।

মিলি কাছে এসে বলে, "দেখ মন্দিরাদি, এই লোকটি তোমার মতো গম্ভীর, আমার স্বামীর বন্ধু, এর সঙ্গে আলাপ করবে না?"

মন্দিরা চেয়ে দেখে ব্রজসুন্দর, শাদা ধুতি পাঞ্জাবী গায়ে, এক জোড়া সবুজ জুতো পায়ে, মুখে স্মিত হাসি। মন্দিরা হেসে বলে, "আসুন ব্রজসুন্দরবাবু, গম্ভীর লোকদের উৎসবে ও রাজদ্বারে পরস্পরের সহায়তা করতে হয়। আসুন, এখানে বসুন।"

ব্রজসুন্দরের মুখখানি প্রসন্ন হয়, অন্তরের দুর্ভাবনা কমে যায়।

মন্দিরা বাড়ির কথা বলে না, অনিলার গানের কথা বলে। ব্রজ-সুন্দরকে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহী বলে মনে হয় না। মন্দিরা তাকে তিরস্কার করে, দেশের ঐতিহ্য কেমন করে সৃষ্ট হয় সে কথা বুঝিয়ে বলে। ব্রজসুন্দর মৃদু হেসে কোনো তর্ক করতে অস্বীকার করে। বলে, "বরং চলুন, আইসক্রীম খাওয়া যাক।"

ফিরবার পথে ক্লান্ত অনিলা অভিমান করে বলে, "কেন ব্রজসুন্দরের নতুন গাড়িতে করে আসতে রাজী হলে না দিদি, ওকে তো বেশি ঘুরে যেতে হত না। আর তোমার ট্যাক্সিভাড়া বেঁচে যেত। ন্যাপলা ট্রাম ধরত।"

মন্দিরা সংক্ষেপে বলে, "নারে, এই ভালো।" মাসিমা বসবার ঘরে আলো জেবলে বসেছিলেন। "কেন জেগে রইলে, মাসিমা? বলেছিলাম তো দশটার মধ্যে ফিরব, ন্যাপলা ছিল, কোনো ভাবনা ছিল না, মিছি-মিছি তোমার কষ্ট হল।"

"কষ্ট কিছু নয়। আমার তো একটা কর্তব্যজ্ঞান আছে, আমাদের সময়ে এরকম বড়দের বাদ দিয়ে কুমারী মেয়েদের নেমন্তন্ন করা দস্তুর ছিল না। আর যদি কখনো বড়রা যেতে না পারতেন, যাঁরা নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁরাই যাওয়া-আসার ব্যবস্থা করে দিতেন।"

অনিলা রাগ করে বলে, "ভাগ্যিস সে সব দিন চলে গেছে। তা নইলে কেউ আর পার্টি দিত না। কী রকম গাইলাম, কেমন পার্টি হল কিছু জিগগেস না করে কেবল বকুনি আর বকুনি।"

মাসিমার বিরক্তি তক্ষুনি চলে যায়। মেয়েদের কাছে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করেন। ব্রজসুন্দরের নাম কেউ উচ্চারণ করে না। এত রাত্রে আর ভালো লাগে না।

শুয়ে-শুয়ে বহুক্ষণ অনিলা উৎসবের গল্প করে, তারপর প্রসন্ন বদনে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মন্দিরার চোখে ঘুম নেই। কেন আমরা তুচ্ছ জিনিস দিয়ে জীবনকে ভারাক্রান্ত করি, কী খেলাম কী পরলাম আর পাঁচজনে কী পরল, তাতে কিবা এসে যায়! যদি কেউ কোনো সমালোচনা না করত উৎসব তবে সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

ব্রজসুন্দরও একলা তার সুশ্রী নতুন গাড়িতে করে বাড়ি ফেরে। দিদি ভাগলপুর গেছেন, মণিমালা শান্তিনিকেতনে, আলো জেবলে কেউ বসে নেই। দোতলার ঘরে খুকি ও তার আধাবয়সী তাম্রবর্ণা সহচরী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ব্রজসুন্দর শূন্য হৃদয়ে শয্যা অবলম্বন করে। ভাবে কিছুর কোনো মানে হয় না। ভগবান-টগবান নিশ্চয়ই নেই, থাকলেও তাঁর একটা উদ্দেশ্য বলে কিছু নেই। লাইব্রেরির নতুন উপন্যাসখানি খোলে। চোখে ঘুম আসে, দূরে যেন রঙ্গমঞ্চের বাজনা শুনতে পায়।

খুকির মা হয়তো নাম করা গায়িকা। কে জানে সে রবীন্দ্রসংগীত জানে কিনা। ব্রজসুন্দরের বন্ধু নিখিল বলে রবীন্দ্রসংগীত আসলে গানই নয়, সুর করা আবৃত্তি। মন্দিরাকে কথাটা বললে নিশ্চয়ই রেগে যেত। মনে পড়ে মন্দিরার প্রশস্ত প্রসন্ন ললাটের উপর কোমল ভ্রূ রেখা। ব্রজসুন্দর নিদ্রাভিভূত হয়।

সেই শনিবার মণিকা-মাসিমা অভ্যাস অনুসারে চা পান করতে এলেন। অনিলা আজ খাবার করেছে। "তেমন সুবিধের হয়নি, মণিকা-মাসিমা, এ বিষয়ে দিদি বেশি ওস্তাদ।"

মণিকা-মাসিমা সিঙাড়ায় কামড় দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বলেন, "কেন, বেশ তো হয়েছে।"

মাসিমা তক্ষুনি জানতে চান, "আবার কী হল মণিকা, গলার আওয়াজটা ওরকম শোনাচ্ছে কেন?"

"নাঃ, কিছু নয়, তবে বাড়িতে আজকাল মন বসে না। দেখ, হেমনলিনী, জীবনে যত রকমের দুঃখ আছে তার মধ্যে নিঃসঙ্গতা হল সবার চেয়ে বড়। যত দিন কাজকর্ম ছিল, একথা বুঝতে পারিনি এখন দিনে-দিনে, পলে-পলে, সেকথা অনুভব করি। মেয়েরা, সময় থাকতে সাবধান হও, বুড়ো বয়সে আমার মতো নিঃসঙ্গ হয়ো না।"

মন্দিরা হেসে বললে, "বুড়ো হয়ে পেনসন নিয়ে নিজের একখানি জীবনী লিখব স্থির করেছি মণিকা-মাসিমা, তিন ভলিয়ুম লম্বা, আর নিঃসঙ্গ হবার সময় থাকবে না। তাছাড়া অনিলার একটি-দুটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে এসে মানুষ করে দেব, ও নিশ্চয় অত পেরে উঠবে না। দেখুন না, মাসিমার অত একলা বোধ করবার ফুরসুতই হয় না।"

হেমনলিনী দেবী খোলা জানালা দিয়ে দিগন্তের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে বললেন, "একলা এসেছিলে মণিকা, একলা যাবে। কারো সাধ্য নেই

তোমার নিঃসঙ্গতা দূর করে। আমার নানান সাংসারিক ভাবনা চিন্তার মধ্যেও বুকের মাঝখানটা চিরকাল শূন্য থাকে।”

মন্দিরার মনে হয় কোথায় যেন তার ত্রুটি হয়েছে। মাসিমার মনের শূন্যতা অনেকখানি তার ভরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ভাবে বাইরের অবলম্বন খুঁজতে হয় না, হৃদয়ের নিভৃত অন্তরালে পাথেয় থাকার প্রয়োজন। ভাবে আমিও মাসিমার মতো নিঃসঙ্গ। একদিন বাবা-মা ভাই-বোনেরা আমার চিত্তলোকে অবাধে যাওয়া-আসা করত, শঙ্করও সেখানে এসেছিল বিজয়রথে। তারপর বহুদিন হয়ে গেছে কেউ আর আসে না, দরজাও হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। অনিলা তার লাবণ্য নিয়ে বাইরে আনা-গোনা করে, প্রবেশ করবার চেষ্টা করে না। ভাবে, সব দোষ আমার, অনিলার নয়। কেমন যেন হয়ে গেছি।

এসব কথা অনিলার ভালো লাগে না। মাসিমার কোল ঘেঁষে বসে, গালে গাল লাগিয়ে বলে, “ইস, একা না আরও কিছু, আমরা আছি না?”

মাসিমা ম্লান হেসে তার কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে বলেন, “তুই তো বিয়ে করে চলে যাবি। শুনেছি সেদিন মিলির বাড়ি সবাই নাকি তোকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। যাকে-তাকে বিয়ে করিস না অনিলা—তোর মা'র মতো। কী রূপ ছিল তার। আমারও সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল, কিন্তু ওর মতো নয়। কিছুই হল না শেষ অবধি, সারাটা জীবন কষ্ট করল শুধু। কেবল রূপ দেখে ভুলে যাস না।”

মণিকা-মাসিমা বিবাহ সম্বন্ধে দর্শকের অভিজ্ঞতা নিয়ে বললেন, “তিনটি জিনিস দেখবে, পাত্রের তিনটি গুণ থাকা চাই-ই, সচ্ছলতা, স্বাস্থ্য আর সৎচরিত্র। সৌন্দর্য না থাকলেও চলে। আমার বাবা নামকরা কদাকার ছিলেন, কিন্তু আমার মা বড় সুখী ছিলেন, আমরাও ছিলাম।”

মণিকা-মাসিমা খুদে একখানি রুমাল বের করে চোখ মোছেন।

শেষে অনিলা বললে, “মাসিমা, আমার বিয়ে হয়ে গেলেও দিদি তো তোমার কাছে থাকবে, তবে আর একা পড়বে কী করে?”

বাহুপাশে আবদ্ধ হয়েও মনের যে নিদারুণ নিঃসঙ্গতা ঘোচে না সুখী অনিলা তার কোনো সংবাদ রাখে না।

মণিকা-মাসিমা নতুন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, "ঐ যে আমার পাশের বাড়ির ব্রজসুন্দর ওর কী নেই? টাকা-পয়সা, বাড়ি-ঘর, চাকর-দাসী, গাড়ি বাগান সব আছে, মায় একটি অনাত্মীয় শিশু পর্যন্ত বাদ যায়নি, কিন্তু ও কি নিজের নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে পেরেছে? কত সময় আমার শোবার ঘরের জানালা থেকে দেখেছি, গভীর রাত্রি অবধি বই পড়ছে আর পায়চারি করছে। ওর দিদি থাকতে এরকম হত না, যেই না রাত দশটা বাজা, ওর সাধ্য ছিল না আলো জেবলে রাখে। দিদি নিজে উঠে এসে নিবিয়ে দিয়ে যেত—এখন বুঝছে একলা কাকে বলে।"

মন্দিরা ধীরে-ধীরে উঠে গিয়ে রান্নাঘরে যায়। "ন্যাপলা, যাও, চায়ের বাসনগুলি নিয়ে এস।"

ভাগ্যিস সংসার ছিল, ভাগ্যিস সংসার তার প্রতিমুহূর্তের চাহিদা নিয়ে প্রতিদিনকার অগণিত মুহূর্তগুলিকে নিঃশেষ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত এমনি করে জীবনও নিঃশেষ হয়ে যায়, আর তার কিছু বাকি থাকে না।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৭ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ব্রজসুন্দর মনে করেছিল সংসার চালানো বুঝি বড় সহজ ব্যাপার, মাত্র দুটি জিনিসের প্রয়োজন থাকে, অর্থ ও ভৃত্য। কাজের বেলায় দেখল চার-দিক থেকে নানান ঝঞ্ঝাট এসে উপস্থিত হয়। সুরেনের সঙ্গে আয়ার মন কষাকষি চলতে থাকে, ঠাকুরের সঙ্গে সুরেনের বাক্যালাপ বন্ধ, খৃষ্টীয় আয়ার সঙ্গে বামুনঠাকুরের অসহযোগ। তা ছাড়াও গোয়ালার সঙ্গে সংঘর্ষ, রসদ নিয়ে গোলমাল, ভাগবাটরা নিয়ে আন্দোলন। মনে-মনে ব্রজসুন্দর নয়নতারাকে তারিফ না করে পারে না। দীর্ঘকাল অবলীলাক্রমে এই সকল বাধাবিঘ্ন সে অতিক্রম করে এসেছে, ব্রজসুন্দর ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

সকালে চা পেতে দেরি হয়, ঠাকুর-চাকর কারো ঘুম ভাঙে না, আর তো তাদের নিত্য ডেকে দেবার জন্য নয়নতারা নেই। বাজারের হিসেব বাড়ে, ভালো জিনিস আসে না, রেশন কুলোয় না, ইলেকট্রিকের বিল বেড়ে যায়। ঠাকুর এসে নালিশ করে সুরেন দুপুরে খাবারঘরের পাখা চালিয়ে ঘুমোয়। সুরেন জানায় ঠাকুর রোজ বাটি ভরে কার জন্য ঘি নিয়ে যায়। দুজনেই বলে আয়ার ম্লেচ্ছাচার অসহ্য, আয়া বলে নিত্য তার খাবার অসুবিধে।

সংসারের উপর ব্রজসুন্দরের ঘৃণা জন্মে যায়, কাব্যগ্রন্থে মনোনিবেশ করে। খুকির কান্নায় ব্যাঘাত হয়। আয়া ওকে কষ্ট দেয় না তো? যদি মণিমালাও থাকত তবু ভালো হত। কিন্তু মণিমালা শান্তিনিকেতনে গুছিয়ে বসেছে, কলেজে পড়ছে, গান শিখবার সুযোগ পেয়েছে, কত তার নতুন বন্ধু-বান্ধব, ব্রজসুন্দরের জন্য তার সময় কোথায়?

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে নয়নতারার একখানি অশান্তিকর চিঠি পায়। দিদি লিখেছে, মেজ জার ভাইয়ের সঙ্গে মণিমালার বিবাহের সম্বন্ধ করেছি আগামী বোশেখেই শুভকর্ম সম্পন্ন করবার ইচ্ছে, ফর্দ ইত্যাদি প্রস্তুত হচ্ছে, বিবাহ ভাগলপুরে মণিমালার পিতৃগৃহেই হবে। ব্রজসুন্দরকে কোনো দায়িত্বই গ্রহণ করতে হবে না, কেবলমাত্র ব্যয় নির্বাহ করলেই চলবে। তাও কিছু অন্যায় রকমের নয়, কারণ তারা পণ নেবে না, কেবল মাত্র বিবাহের খরচটুকু। সব নিয়ে হাজার দশেকের বেশি লাগবে না।

ব্রজসুন্দরের বাক্য রোধ হল। কী আশ্চর্য! এক বছর আগেও এই ব্যবস্থাতে তার বিশেষ আপত্তি হত না, ছেলেটির স্বভাবচরিত্র, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করে, নিশ্চিন্ত মনে ভাগ্নীর বিবাহের আয়োজন করত। মণিমালার দিদি কিরণমালারও এই রকম বিবাহই হয়েছে। সে এখন পরম সুখে গুটিতিনেক ছেলেপুলে নিয়ে স্বামীর ঘর করছে। কী এমন মন্দ হয়েছে? সে বিবাহের সম্বন্ধ ব্রজসুন্দরের একজন বন্ধু সম্পন্ন করেছিলেন। তখন ব্রজসুন্দরের মনে কোনো প্রশ্নই জাগেনি। এই সম্বন্ধের কথা শুনেই কেন মন বিরূপ হয়ে উঠছে?

ব্রজসুন্দর স্থির করল এ বিবাহে সে সম্মত হবে না। চিঠিখানি আবার পড়তে গিয়ে লক্ষ্য করল নয়নতারা কোথাও তার সম্মতি প্রার্থনা করেনি।

ব্রজসুন্দরের বিষম রাগ হল। কখনো সে মত দেবে না। দিদি মত না চাইলেও, খরচ চেয়েছে। খরচও দেবে না। মণিমালাকে বি. এ. পাশ করতে হবে। বিয়ে হয় হবে, নয় নাই বা হল। মোট কথা মণিমালার পড়া ছাড়ানো হবে না।

ব্রজসুন্দর চিঠি হাতে উঠে পড়ে। সুরেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে, বাবু কিছু খেলেন না? শরীর অসুস্থ নয় তো? ব্রজসুন্দর তাকে আশ্বাস

দেয়, "না না, এমনি খিদে নেই।" একতলার শোবার ঘরে ছোট টেবিলের সামনে বসে দিদির চিঠির সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখে। এখন মণিমালার বিয়ে হতে পারে না, ব্রজসুন্দরের এবং মণিমালার দুজনেরই অমত।

সুরেনকে ডেকে চিঠি ডাকে দিতে দেয়। তবু মন শান্ত হয় না। ভাবে এ কিছু না, দিদি আমাকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যে এই সম্বন্ধ করেছে। কিছুতেই আমি এই বিয়ে হতে দেব না। আমাদের পরিবারের অন্তত একজন মেয়ে লেখাপড়া করুক। খুকিও বড় হলে করবে। ও ডাক্তারি পড়বে। না, এখন থেকেই স্থির করতে হয় না। ওর মন পরীক্ষা করতে হয়, কোন দিকে স্বাভাবিক প্রেরণা তাই পর্যবেক্ষণ করতে হয়। যাই হোক, মোট কথা লেখাপড়া শিখবে।

নিজেকে ছোটখাট একজন বিদ্যাসাগর বলে মনে হতে লাগল ব্রজসুন্দরের।

লেখাপড়া শিখে মণিমালা হয়তো মন্দিরার মতো হবে।

তাও কী কখনো হয়? একজনকে কী আর আরেকজনের মতো বানিয়ে ফেলা যায়? মণিমালা যদি মন্দিরার মতো হতে সমর্থ হয়ও, তা হলেই বা ব্রজসুন্দরের কী এসে যাবে? কারো সঙ্গে ব্রজসুন্দরের কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই। কী আশ্চর্য, এ কথা ব্রজসুন্দরের আগে কখনো মনে হয়নি। বন্ধু-বান্ধব দেদার আছে, কিন্তু তারা নিজেদের জীবন নিয়েই ব্যস্ত। একমাত্র নয়নতারার উপরই ব্রজসুন্দর নির্ভর করে থাকত, সে চলে যাবার পর ব্রজসুন্দরের আর কোনো দুর্বলতা নেই। সে এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন।

ব্রজসুন্দরের মনে কোনো দুর্বলতা না থাকলেও মন্দিরাদের সঙ্গে আর একটু বন্ধুত্ব হলে বেশ হত, কিন্তু যেদিন ব্রজসুন্দর ওদের নিমন্ত্রণ করেছিল ওরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। ব্রজসুন্দর মন্দিরার উপর রাগ করতে চেষ্টা করেছিল। পরে ভেবেছিল ব্যক্তিগত সম্বন্ধ না থাকলে রাগই বা হবে কেন? মন্দিরার উপর রাগ হয়নি।

এদিকে অনিলার গানের ওস্তাদ নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন, লোকটি রোগা, আধবুড়ো, নীরস। প্রথম দিন এসেই রবি ঠাকুরের গান বাতিল করে দিয়ে, অনিলার গলা সাধাতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভালো গলা নিঃসন্দেহ। এমন গলার তোয়াজ করতে হয়। এতদিন বাজে মাস্টারের কাছে গান শিখে এমনিতেই যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে। তাঁর কথায় মনে হল একমাত্র বর্তমান মাস্টার ব্যতীত আর সব মাস্টারই বাজে।

দোতলার ভাড়াটেদের সঙ্গে অনিলার বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয়। অদ্ভুত তাদের জীবনযাত্রা। পাঁচটি প্রাণীর পাঁচরকমের জীবন প্রণালী, অথচ সব ব্যবস্থা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে। কেউ নিরামিষভোজী কেউ বা আমিষ-ভোজী, কেউ খায় ফলমূল; কেউ বা সাত্বিক ভাবের, কেউ বা ম্লেচ্ছ। দুজন বুড়োমানুষ ছাড়া সকলেরই বাইরে কাজকর্ম, সকলেই সকালে চায়ের পর্ব সমাধা করে, সেজে-গুজে বেরিয়ে যায়, দুপুরে সকলে বাইরে খাওয়া-দাওয়া করে, কর্মস্থলেই চা পান করে, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দুজন চাকরের সাহায্যে নিজের-নিজের ব্যবস্থা করে নেয়। নির্ঝঞ্ঝাট, নির্বিঘ্ন ব্যবস্থা।

মন্দিরা খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে হাসিমুখে শুধোয়, "অতিথি এলে কী করে?"

অনিলা সহসা গম্ভীর হয়ে যায়।

"দিদি, ওদের বাড়ি সত্যি অতিথি আসবে। কারা আসবে জানো? শঙ্কর আর তার মা। শঙ্কররা ওদের কে যেন হয় একদিন বলেছিলাম না? শঙ্করের বাবার শরীর অসুস্থ। ওর সেই সুন্দরী বোন পম্পার খুব ভালো বিয়ে হয়ে গেছে। এখন নাকি সে বড় একটা কারো সঙ্গে মেশেই না। আর সব চেয়ে মজার কথা হল যে শঙ্করের আজ অবধি বিয়েই হল না। মনের মতো মেয়ে পেলেন না, ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় করে এবার নাকি শঙ্করের মা পণ করেছেন ছেলের বিয়ে দেবেনই। দেখ, তোমার এখনো একটা চান্স থাকতে পারে।"

বিরক্তি দমন করে মন্দিরা বললে, "এত সব তথ্য কার কাছ থেকে পাস বল তো?"

"ও মা জানো না, দুপুরে যখন মাসিমা বিশ্রাম করেন, ওদের বাড়িতে কেউ থাকে না, তখন আমি গুটি-গুটি উপরে গিয়ে বুড়োমানুষের সঙ্গে গল্প করতে-করতে সব খবর বের করে আনি। ওরা সকলে চাঁদা করে সংসার চালায় কিনা, তাই সবার মহাভাবনা হয়েছে। যদি চটপট শঙ্করের একটা বিয়ে স্থির না হয়, তাহলে তো মুশকিল। একটু বুদ্ধি করে যদি ব্যাপারটা ম্যানেজ কর, ওদের বাড়িশুদ্ধ সবাই তোমার বড় অ্যালাই হবে।"

মন্দিরা ভ্রূকুটি করে বললে, "ছিঃ! কী বলে পরের ব্যাপারে নাক ঢোকাতে যাস? আর মাসিমা পছন্দ করেন না জেনেও কেন এত ঘন-ঘন যাওয়া-আসা করিস বল তো?"

অনিলা বললে, "তা নইলে যে দিন কাটে না আমার। খাই-দাই গলা সাধি। ওতে কি দিন কাটে? কী বলতে চেষ্টা করছ তাও জানি। কিন্তু পড়াশুনো আমার পোষায় না, সেলাই-ফোঁড়াই হাতে আসে না, রান্নাবান্না তুমি সঙ্গে না থাকলে পারি না, গাড়ি-ঘোড়া নেই যে বেড়াতে বেরোব, তবে আর পাড়াবেড়ানো ছাড়া কী বাকি থাকে বল? সত্যি করে বল দিকিনি, শঙ্করের খবর এনে দিয়েছি বলে খুশি হয়েছ কিনা?"

মন্দিরা কোন অদৃশ্যলোকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললে, "খুশি-অখুশি ব্যক্তিগত কথা অনিলা। এতদিন শঙ্করকে দেখিনি যে তার মুখের চেহারাও মনের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তাকে চেনালোকের গোষ্ঠিতে আর ধরা যায় না। আমিও বদলে গেছি, সেও নিশ্চয় বদলে গেছে। এখন ওঠ, খাবার সময় হয়ে গেল, রান্নাঘরে গিয়ে একটু খোঁজ নেওয়া যাক।"

অনিলাও উঠে পড়ে। "জোর করে মন শক্ত করেছ, না দিদি? শঙ্কর খুব ভালো দেখতে, আমি তার ছবি দেখে এলাম। আগের চাইতেও সুন্দর দেখতে। কিন্তু মা'র কথায় ওঠে-বসে, ও আবার কী রকম পুরুষমানুষ?"

সে রাত্রে মন্দিরা বহুক্ষণ জেগে থাকে। জ্যোৎস্নায় ঘর ভরে যায়। মন্দিরা ভাবে একদিন শঙ্করকে ভালোবেসে ছিলাম। তার চারদিকে মনে-মনে ভবিষ্যতের মর্মর প্রাসাদ রচনা করে ছিলাম, ভেবে ছিলাম সে আছে বলে আমার জীবনের অর্থ আছে। শঙ্করের মা বিবাহে মত দিলেন না, শঙ্কর সজল চোখে বিদায় নিয়েছিল। আমি একবারও তার কাছে কোনো মিনতি জানাইনি। সে আমার জীবন থেকে অপসারিত হয়ে গেল। আমার হৃদয়ের কপাট বন্ধ হয়ে গেল। আর কোনোদিন সে আমাকে বিচলিত করতে পারবে না।

শনিবার মণিকা-মাসিমা অভ্যাসমতো চা পান করতে আসেন। মাসিমা ইদানিং একটু যেন দুর্বল হয়ে পড়েছেন। দুর্বলতাটাকে ঠিক দৈহিক বলা চলে না। মনটা যেন নিস্তেজ হয়ে এসেছে, তর্ক করবার উৎসাহ যেন কমে গেছে, খুঁত ধরবার প্রবৃত্তিও তেমন দেখা যায় না। মন্দিরা উদ্বিগ্ন হয়। অনিলা আশ্চর্য হয়ে বলে, "এতো বেশ মজা! মাসিমার শরীর ভালো হলে তোমার মেজাজ খারাপ হতে থাকে। আর মাসিমার শরীর খারাপ হলে তোমার মন খারাপ হতে থাকে।"

মণিকা-মাসিমাও সেই কথাই উত্থাপন করলেন। "কী হল হেম-নলিনী, আমাদের কি আর হাল ছাড়লে চলবে? তোমার বাড়িতে সারাক্ষণ আজকাল হৈচৈ লেগে আছে, তার একটা স্ট্রেন আছে তো। বরং আমার বাড়িতে দিন আষ্টেক থেকে আসবে চল। আমি একটা চালাক-চতুর ছোকরা রেখেছি আজকাল, তোমার কোনো কষ্ট হবে না। বেশ হাওয়া বদল হবে।"

মাসিমা হঠাৎ কিছু স্থির করে উঠতে পারেন না। চামচ দিয়ে চা নাড়তে-নাড়তে মণিকা-মাসিমা বলেন, "আমার সঙ্গে কিছু দিন থাকলেই অন্যরকম হয়ে যাবে, দেখো। কী জানি কেন ছোটবেলা থেকেই দেখেছি

বিপদে আপদে পড়লেই লোকে আমার কাছে ছুটে আসে। এই তোমাদের ঐ ব্রজসুন্দরটিকেই দেখ না। দিদিটিকে তাড়িয়ে দিব্যি স্বাধীনতা ভোগ করছিল। এমনি সময় কথা নেই বার্তা নেই, ওদের ঐ হিন্দুস্থানী আয়াটি ভির্মি গেল। চোখ উল্টে, হাত-পা ছুঁড়ে একেবারে কাঠ! তাই দেখে ব্রজসুন্দর নিজেই ছুটে এল আমার কাছে। শিগগির চলুন, ও বোধহয় মরে-টরে গেছে। আমিও উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে আয়ার মাথায় খানিকটা ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়ে, দিলাম কষে গালে এক চড়। এসবই আমার বিলেতে গিয়ে শেখা। চড় খেয়ে তৎক্ষণাৎ ভির্মি সেরে গেল। তারপর তাকে খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে চলে এলাম। ব্রজসুন্দরকে ছেড়ে কথা বলিনি। বললাম দিদি বেচারাকে ভাগিয়ে এখন ঠেলা বোঝ! দেখলাম একটুও লজ্জা নেই, বললে ভাগ্যিস আপনি ছিলেন! দিদি থাকলেই বা কী হত, ওকে ছুঁতোও না! সত্যি কথা বলতে কি হেমনলিনী, একটু খুশি না হয়ে পারলাম না। বাস্তবিক নয়নতারার অনেক গুণ থাকলেও এডুকেশনের অভাবে মনটা একেবারে অন্ধকার। ব্রজসুন্দরের মতো বিদ্বান ছেলের ওর সঙ্গে বাস করা সত্যিই মুশকিল। চেহারাখানি বেশ। কী জানো, আমার নিজের গায়ের রঙটা ফরসা কিনা, ফরসা মানুষ দেখলে আপনা থেকেই কেমন যেন মায়া হয়।"

মণিকা-মাসিমার কথা নদীর স্রোতের মতো অবিরাম বয়ে যায়। মন্দিরার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ব্রজসুন্দরের সুশ্রী সুগম্ভীর উদ্বিগ্ন মুখচ্ছবি।

অনিলা উৎসাহিত হয়ে বলে, "সত্যি মণিকা-মাসিমা, খাসা দেখতে, চেহারার মধ্যে দিশীধরনের একটা স্মার্টনেসও আছে, গোঁড়া হিন্দু বাড়িতে যে আবার এমনটি হয় এ আমি ভাবিনি।"

মাসিমা প্রসন্নভাবে অনিলার দিকে তাকিয়ে মণিকা-মাসিমাকে বললেন, "দেখতে ভালো তো আর সব নয়। তোমাদের কাছেই তো শুনেছি ওর গতিক ভালো নয়। তুমিই তো আমাকে ওর সম্বন্ধে বারবার সাবধান

করে দিয়েছ। আজ আবার ওর প্রশংসা করছ যে? তোমাদের মতামতের কোনো স্থৈর্য নেই।"

মিস লাহিড়ী কারো কথা সইতে পারেন না।

"কী যে বল হেমনলিনী! ওর দিদির কাছে যা শুনেছিলাম তাই বলেছিলাম। তার তো ভুলও হতে পারে। ঐ তো ব্রজসুন্দর, ভাগ্নীকে জোর করে লেখা-পড়া শেখাচ্ছে। সেটা কি ভালো নয়?"

মাসিমা বললেন, "আর ঐ যে মেয়েটির কথা বলছিলে"—আরও কী যেন বলতে গিয়ে অনিলার উপস্থিতির কথা স্মরণ করে বিরত হলেন।

মন্দিরা নীরব রইল।

হয়তো জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু আজ সাতাশ বছর ধরেও মন্দিরা তা খুঁজে পায়নি। বারে-বারে মনে হয়েছে এই বুঝি সে, বারে-বারে ভুল ভেঙে গেছে। স্কুলে-কলেজে পড়বার সময়ে ভাবত বুঝি বা ক্লাসে প্রথম হওয়ার একটা অপরিসীম মূল্য আছে, পুরস্কার নিয়ে বাড়ি ফেরার একটা গৌরব আছে। এখন দেখে ওসব কিছু নয়, মন্দিরা ক্লাসে প্রথম না হয়ে, দশম হলেও বিন্দুমাত্র এসে যেত না। তারপর একটা সময় এসেছিল যখন মনে হয়েছিল শঙ্করকে সুখী করবার জন্য নিজেকে সুন্দর করে তুলতে হবে। কাজকর্ম শিখতে হবে, শঙ্করের যেন কখনো কোনো কষ্ট না হয়। আজ সেই শঙ্করের স্মৃতিটুকুও অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে। তারপর মাসিমার কাছে এসে জীবনটাকে আবার নতুন করে গুছিয়ে বসতে হয়েছিল। মনে হয়েছিল আপিসে উন্নতি না করলে জীবন বুঝি ব্যর্থ হয়ে যাবে। আপিসে মন্দিরা উন্নতি করেছে, আরও করবে। মনকে শাসন করে বলে, সার্থকতা আছে বই কি, এই তো মাকে মাসে-মাসে একশো টাকা পাঠাতে পারছি, এটা কি এক ধরনের সার্থকতা নয়? সহসা গর্বে বক্ষ স্ফীত হয়, চিরদিন যেন মাকে সাহায্য করতে পারি। সারা জীবন কত না কষ্ট করেছেন মা। বাবার কথা মনে পড়ে। ভাই বোনদের কথা মনে পড়ে। মাথার ভিতর টনটন করতে থাকে। তারা সকলে ভালো থাক, কিন্তু

মন্দিরার সঙ্গে তাদের হৃদয়ের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। সে চলে বলে ভাবে, আলাদা রকমের। তাদের কাছে পনেরো দিন বাস করলে সে হাঁপিয়ে ওঠে। আবার দূরে থাকলেও মা'র জন্য সারা চিত্ত ব্যথিত হয়ে ওঠে, অসীম অধৈর্যে ভরে ওঠে।

অনিলা এসে পাশে বসে। চিন্তাজাল ছিন্ন হয়। সুখী শৌখিন অনিলা, একুশ বছর তার বয়েস। ভবিষ্যৎ তার রঙিন স্বপ্নে মাখা। সহসা গভীর মমতায় মন্দিরা অনিলার পদ্মফুলের মতো হাতখানিকে ধরে।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৮ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মন্দিরার দুদিন ধরে শরীর তেমন ভালো ছিল না। আপিসে কাজের মাত্রাও একটু বেশি ছিল। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ক্লিষ্টমুখে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে দেখে বসবার ঘরে অতিথি বসে আছেন। মাসিমা তাঁর পুরোনো গরদখানি পরে রুপোর চা-দানি থেকে চা ঢালছেন। অনিলা তার নতুন গোলাপী রেশমী শাড়ি পরে প্লেটে করে সিঙাড়া সন্দেশ পরিবেশন করছে। আলমারিতে সযত্নে তুলে রাখা নীল উইলো গাছের ছবি আঁকা বহুমূল্য সব চায়ের বাসনগুলি টেবিলে শোভা পাচ্ছে। মণিকা-মাসিমা শাদা জর্জেট আর মুক্তোর মালা পরে সুশ্রী, ক্ষীণাঙ্গী, কুঞ্চিতকেশা, সুবেশা একটি মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন। সে মহিলাটির বয়েস অনুমান করা কঠিন; চোখের কোণে-কোণে দাগ পড়েছে, অত্যন্ত পাতলা ঠোঁটের কোণেও বলী রেখা; গৌরবর্ণা, সুগন্ধা; পরনে ফিকে নীল শিফনের শাড়ি, পায়ে ছাই রঙের স্যান্ডাল, কোলে ছাই রঙের হ্যান্ড-ব্যাগ, মণিবন্ধে সরু নীল মীনে-করা একগাছি করে সোনার চুড়ি, গলায় নীলাবসানো সরু একছড়া মুক্তোর মালা। তাঁর চোখের উপর তার ক্লান্ত স্থির দৃষ্টি পড়তেই মন্দিরা তাঁকে চিনতে পারল, তিনি শঙ্করের মা।

শঙ্করের মাও তাকে চিনতে পারলেন। ভাবলেন এ সে মন্দিরা নয়। একে অমন এক কথায় বিদায় করে দেওয়া যেত না। এর সেই আগের সৌন্দর্য ঝরে গেছে। ছিল ফুলের মতো, এখন হয়েছে ইস্পাতের তলোয়ারের মতো।

মন্দিরা দু'হাত তুলে তাঁকে ছোট একটি নমস্কার করল। জিগগেস করল, "ভালো আছেন?"

"ভালো আছি, মন্দিরা। তুমি কত বদলে গেছ।"

মন্দিরা হেসে বললে, "জরার দিকে আরও সাত বছর এগিয়ে গেছি যে।" ইস্পাতের তলোয়ারে সূর্যের কিরণ পড়ল।

মন্দিরা মাসিমার দিকে ফিরে বললে, "দেরি হয়ে গেল, মাসিমা, কাজের বড় ভিড়। নইলে আর এমন মলিন বেশে তোমার চায়ের আসরে আসতাম না। যাক, পাঁচ মিনিট সময় দাও, দেখি কী করতে পারি।" তারপর আলোর দিকে ফিরে বলল, "ভালো আছ তো শঙ্কর? কত দিন পরে দেখা বল তো?"

মন্দিরা নিজের ঘরে চলে গেলে মুহূর্তকাল সকলে নিস্তব্ধ রইল, তারপর অনিলা শঙ্করকে বললে, "বাঃ, দাঁড়িয়েই রইলে যে, বোস, এই নাও, ধর।" চায়ের পর্ব চলতে থাকে।

মন্দিরা মনকে শিখিয়েছে অযথা উদ্বেলিত না হতে। মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে হাত-মুখ ধুয়ে, চুল ঠিক করে সরু সোনালী পাড় দেওয়া একখানি নীলাম্বরী শাড়ি পরে, প্রসন্নমুখে শঙ্করের মায়ের পাশে এসে বসল। কোথাও উৎকণ্ঠার লেশমাত্র নেই, কেবল গলার একটি শিরা ধুক-ধুক করছে, খানিক বাদে তাও শান্ত হয়ে গেল।

শঙ্করের মা বুঝিয়ে বললেন, "মাস দুয়েকের জন্য কলকাতায় এসেছি, তোমাদেরই উপরতলার বাসিন্দা হয়েছি। ওঁরা আমাদের নিকট আত্মীয়, কিন্তু এসে যেন অথৈ জলে পড়েছি, ওঁদের সংসারের যেন কুল-কিনারা পাওয়া যায় না। সারাদিন আমার দুই বুড়ি পিসিমা ছাড়া আর কারো দেখা নেই। দুই ভাই আপিসে চাকরি করে, দুই ভাজ আপিসে চাকরি করে, একটি বোন সেও আপিসে চাকরি করে। এ কেমনধারা ঘর-সংসার বুঝেই উঠলাম না। তুমি কোন আপিসে চাকরি কর মন্দিরা?"

মন্দিরা নিজের কাজের কথা, ট্রেনিংএর কথা বলে। নির্বাক শঙ্করকে শুধোয়, "তোমারই বা কী খবর? নিশ্চয় এতদিনে বড় সাহেব গোছের কিছু একটা হয়েছ?"

শঙ্কর শান্ত ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে উত্তর দেয়। মণিকা-মাসিমা কোনো কিছু থেকে বাদ পড়তে অনিচ্ছুক। বলেন, "আরে, শঙ্করের উন্নতি হয়েছে ঢের, কিন্তু উপযুক্ত বউ পাওয়া যাচ্ছে না এই হল মুশকিল।"

অনিলা বজ্রাহতের মতো দিদির পানে তাকিয়ে থাকে। মন্দিরা সহাস্যে বলে, "শুধু এই? আমরা পাঁচজনে মিলে তোমার জন্য ভালো বউ খুঁজে দেব শঙ্কর, তুমি কিচ্ছু ভেব না। আপাতত একটু চা খাওয়া যাক। পয়সা রোজগার করা যে কী জিনিস সে তুমি আর মণিকা-মাসিমা ছাড়া আর কে বুঝবে বল?"

মন্দিরা প্রসন্নমুখে শঙ্করের সঙ্গে আলাপ করে। সাত বছরের সংবাদ সংগ্রহ করে। অনিলাও উৎসাহিত হয়ে বলে, "তোমরা পাটনা থেকে চলে যাবার সময়ে আমার বাবার ভূতের গল্পের বইখানা নিয়ে চলে গেছিলে। সেটা হারিয়ে ফেলনি তো?"

শঙ্করের মা বিস্মিত দৃষ্টিতে অনিলার রূপরাশি নিরীক্ষণ করেন। বেশ মেয়েটি, মনে হচ্ছে বেশ কোমল স্বভাবের। সম্ভবত একটু শৌখিন, একটু আদুরে ধরনের। সে ভালোই। এ সব মেয়েকে সহজেই পোষ মানানো যায়, কারণ এরা নির্ঝঞ্ঝাট সুখ ছাড়া আর কিছু চায় না। ঠোঁট দুটি কচি দোপাটি ফুলের মতো। আপাতদৃষ্টিতে মন্দিরাকে একবার দেখে নেন। মন্দিরার সুদৃঢ় ঠোঁটের রেখাতে শক্তি জমা রয়েছে। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টিকে কখনো ফাঁকি দেওয়া যাবে না।

অনিলা একটি পুরোনো ছবির অ্যালবাম বার করলে। পরিচিত সব বুড়োমানুষদের শৈশবের আর যৌবনের ছবি। অনিলা তাই দেখে আকুল হচ্ছে। "দেখ, শঙ্কর, আমার বাবা-মা'র বিয়ের ছবি। দেখ, বাবা যেন রেগে টং, আর মাকে দেখ হাসিখুশিতে ডগমগ! কি বিশ্রী প্যাটার্নের ব্লাউজ দেখ, আবার মাথায় কাপড় দিয়ে জোড়া ব্রোচ লাগানো হয়েছে। কিন্তু কী রূপ ছিল ভাই!"

কখন যেন মাসিমা আর শঙ্করের মাও কাছে এগিয়ে এসেছেন।

মাসিমা অ্যালবামখানি নিয়ে প্রথম পাতাটি খুলে বললেন, "এই দেখ আমার বাবা-মা'র বিয়ের ছবি। দেখ, বাবা দিব্যি কোট পেন্টেলুন পরে দাড়িটাকে কেমন ফ্রেঞ্চ ছাঁট দিয়েছেন। আর মা'র মাথায় তিনকোনা লেসের ভেল দেখ। দুজনেই কত না গম্ভীর, কিন্তু বয়স খুব বেশি ছিল না।" তারপর শঙ্করের মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, "নেলি, তোমার তাঁদের কথা মনে পড়ে? কৃষ্ণনগরে তাঁদের বাগানবাড়িতে বড়-দিনের ছুটিতে তো কতবার তোমরা থেকেছ, মনে আছে?"

শঙ্করের মাও অভিভূতের মতো তাঁর পাশে বসে পড়েছেন। "দেখি দেখি, হেমনলিনী, আরে এ ছবিটা নিশ্চয় ঐ বাড়িতে তোলা। দেখেছ বাগানের সেই শাদা গেটটাও আবছামতো উঠেছে। মনে আছে গেটে চড়ে কেমন দুলতাম, আর মালি কি ভীষণ বকত?"

হেমনলিনী হঠাৎ যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন। "আমার জন্মদিনে পাওয়া গোলাপী সিল্কের ফ্রক কতখানি ছিড়ে গেল একদিন। মা তোমাকে তাই নিয়ে কী না বললেন। তোমার মা কিন্তু তোমাকে কক্ষনো কিছু বলতেন না। আমার বাবা-মা'র ধারণা ছিল ছেলে-মেয়েদের প্রশংসা করলেই তারা অহঙ্কারী হয়ে যাবে। আমি ক্লাসে ফার্স্ট হতাম, তুমি তো কক্ষনো হতে না, অথচ প্রতিবার তুমি প্রমোশন পাচ্ছ বলে তোমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া হত, আমি স্কুল থেকে সোনার মেডেল পেলেও বাড়িতে কিছু হত না। কী যে রাগ হত কি বলব!"

ঢোঁক গিলে হেমনলিনী নীরব হলেন। মণিকা-মাসিমা এরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন, "সেকি হেমনলিনী, অমন তুচ্ছ জিনিস নিয়ে তোমার দুঃখ হত? আমার কখনো হত না বলা উচিত নয়, কিন্তু তোমাদের পড়াশুনা ছিল সব শখের ব্যাপার, তোমাদের গান-বাজনা শেখা, সাজগোজ করার মতো। বিয়ে হয়ে গেলে, বিয়ের বেনারসীর মতো সব ঝেড়ে খুলে ফেললেই হল। তারপর দরকার মতো বের করে নিয়ে আবার পরাও চলে। আমাদের ছিল ক্যারিয়ারের জন্য তৈরি হওয়া। আমাদের লেখা-

পড়া আমাদের এক-একটি অঙ্গের মতো হয়ে গিয়েছিল। যা যখন শিখেছি তাই আমাদের কাজে লেগেছে। ঐ কে আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করল না, কে আমাকে আদর করল না, ওসবকে আমার তুচ্ছ জিনিস বলে মনে হয়।"

অনিলা বুঝল বুড়োরা এবার আবার বুড়ো হয়ে গেছে। গাল ফুলিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলল, "আমার উনত্রিশ বছরের পর আর এক-দিনও বাঁচতে ইচ্ছে করে না।"

মন্দিরা হেসে বললে, "সে কি! তা হলে যে শঙ্করের গত বছরই মরে যাওয়া উচিত ছিল, আর আমার ওর থেকে দেড় বছরের মেয়াদ। না, না, অনিলা অত কৃপণতা চলবে না, মেয়াদটা একটু বাড়িয়ে দাও।"

সকলে হাসে।

শঙ্করের মা উঠে পড়েন। "বড় ভালো লাগল হেমনলিনী। ভাবিনি এত ভালো লাগবে। এবার তোমরা একদিন আমাদের অতিথি হবে। উপরের বাসিন্দারা যখন সন্ধ্যে সাড়ে-সাতটার আগে কেউ ফেরেন না, সেখানেই আমাদের চায়ের পার্টি করা যাবে। কারো অসুবিধে করা হবে না, কী বল?"

তাঁরা বিদায় নিলে মন্দিরা ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসে পড়ে বললে, "একে তো হঠাৎ-চায়ের আসর বলে মনে হচ্ছে না। তোমরা এরজন্য অনেক আয়োজন করেছ, কষ্ট করেছ, মণিকা-মাসিমাকে সেজেগুজে আসতে বলেছ, খালি আমাকেই বুঝি বলনি?"

মাসিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "না, না, মন্দিরা সে রকম কিছু নয়। হাজার হোক নেলি আমাদের ছোটবেলার খেলার সাথী, এখানে এসেছে এতদিন পরে, যাদের বাড়িতে উঠেছে তাদের দেখা মেলা ভার, আমার কি কর্তব্য নয় তাদের বলা? তোমাকে আর বিরক্ত করিনি, কি জানি, যদি তুমি আবার ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে না চাও। রাগ করলে না তো?"

মন্দিরা হঠাৎ হেসে ফেলল, "না মাসিমা। তবে রাগ একটু হয়েছে বৈকি। কিন্তু সে অন্য কারণে। আমার সাহায্য ছাড়াও তোমরা এত ভালো চা পার্টির বন্দোবস্ত করতে পেরেছ দেখে রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।"

মণিকা-মাসিমা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে বললেন, "চলি হেমনলিনী, চলি মেয়েরা। তবে একটা কথা বলে যাই, স্বপ্নেও মনে কর না যে আমাদের বয়েস হয়েছে বলেই আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে। প্রজাপতি-দের কোনো সময়ই কাজের তাগাদা থাকে না, মৌমাছিদের থাকে।"

মণিকা-মাসিমা চলে যেতেই মন্দিরা বললে, "চল অনিলা, রান্নাঘরে চল। আলু মটর ডিম কিস্‌মিস্‌ পেঁয়াজ দিয়ে ভাত ভাজা করি গে। মাংসের বড়াগুলির সঙ্গে খাসা হবে। মাসিমার জন্য নিরামিষ সংস্করণ। অতএব, মাসিমা, তুমিও চল, রান্নাঘরে তোমার জন্য বেতের চেয়ার পেতে দেব, তুমি বসে-বসে আমাদের সঙ্গে তোমাদের ছোটবেলাকার গল্প করবে। আজ আমি এত ক্লান্ত যে একটা হৈ-চৈ না করলে আর চলছে না।" তাই রান্নাঘরেই মজলিশ বসে।

মন্দিরা বললে, "এ বাড়িটার নাম দেওয়া যাক হাউস অফ উইমেন, এখানে মেয়েরাই সব। এই ন্যাপলা, তোকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে কিনা ভাবছি।" ন্যাপলা বুঝলে বাড়িতে আজ একটা হৈ-চৈ লেগে গেছে, বড়দিদিমণি পর্যন্ত তার সঙ্গে রসিকতা শুরু করেছে।

অনিলা বললে, "মাসিমা তোমাদের ঐ নেলিটির ঢং দেখলে? প্রথমটা এসে কত না চাল দেখাল! তারপর একেবারে গলে জল! দিদি, তুমি যদি ছটার সময়ে না এসে পাঁচটার সময়ে আসতে তবে খুব মজা দেখতে পেতে। নেলিমাসি আড় চোখে ইদিক-ওদিক দেখে নিচ্ছেন, তুমি কোথাও লুকিয়ে আছ কিনা, মাসিমার ফার্নিচারের দাম কত, আমি যতটা সুন্দরী বলে শুনেছিলেন সত্যিই ততটা কিনা।"

মন্দিরা বাধা দিয়ে বললে, "তুই যে সুন্দরী এ কথা উনি আবার কোথায় শুনলেন?"

"বাঃ, উপরের বুড়ি পিসিমারা তো আর বোবা নন।" তারপর মুচকে হেসে বললে, "অন্ধও নন, খালি খুব কুড়ে।"

মন্দিরা মাসিমাকে বললে, "তুমিও একটু সাজ না কেন? দেখ তো ক্যায়সা শরীরটাকে রেখেছেন? কে বলবে তোমার সমবয়সী।"

মাসিমা বললেন, "ঠিক সমবয়সী নয়, প্রায় দুবছরের ছোট। ওর জন্মদিনে আমরা নেমন্তন্ন খেতে যেতাম। সে এক মজার ব্যাপার গেছে। আমরা ছিলাম সব তখনকার দিনের সাহেবী সমাজের ছেলে-মেয়ে। জন্মদিনে চিলড্রেন্স পার্টি হত। তোদের মা আর আমি ফ্রিল দেওয়া সব শাদা ফ্রক পরে, গোলাপী নীল রিবন দিয়ে চুল বেঁধে যেতাম। তোর মা'র চুল এমনিতে কোঁকড়া ছিল, কিন্তু আমার চুলগুলোকে তিনকোণা সব কাগজের টুকরো দিয়ে দিয়ে পাকিয়ে-পাকিয়ে কুঁকড়ে দেওয়া হত। ঘোড়াগাড়ি চেপে, কোচম্যান আর দুটি সহিস নিয়ে, সঙ্গে মাদ্রাজী আয়া নিয়ে সব যেতাম। সোজা-সোজা হয়ে চেয়ারে বসতাম। বড়রা নানারকম খেলা অর্গ্যানাইজ করতেন। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গান গাইতাম ইংরিজিতে 'স্যালি স্যালি ওয়াটার!' মাঝখানে একজন স্যালি হত। তাকে আবার একজন সঙ্গী বেছে নিয়ে সবার মাঝখানে চুমু খেতে হত। এমনি ধারা কত কী। তোদের মা'র খুব ভালো লাগত, আমার একটুও না। তারপর খাওয়া হত কেক, স্যান্ডুইচ, আইসক্রীম। সবাইকে ছোট-ছোট উপহার দেওয়া হত। নেলি খুব সাজত, দেখতেও ভালো ছিল। সেই নেলি আজ বুড়ো হয়ে গেছে, তার ছেলেরই তিরিশ বছর বয়েস হল। এমনি করে জীবনটাই কেটে গেল রে মন্দিরা, এখন তোরা সব সুখে বেঁচে থাক, আমাদের ছুটির সময় হয়ে এল।" কী মনে করে মাসিমা হঠাৎ মন্দিরাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, "কারো কথা ভাববি না মন্দিরা, যাতে সুখী হবি তাই করবি।"

মন্দিরার গলার কাছটা সহসা টনটন করে, "কেন মিথ্যা ভাব মাসিমা?"

অনিলা বাতাসটাকে হাল্কা করবার জন্য বলে বসে, "যদি ও সুখী হবার জন্য হিন্দুবাড়ির আধ-বুড়ো দুষ্টু ব্রজসুন্দরকে বিয়ে করতে চায়, তবে কি তাই করবে?"

মাসিমা অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলেন, "কী যে পাগলের মতো বকিস, অনিলা। ব্রজসুন্দরের সঙ্গে আমাদের কী বা সম্বন্ধ আছে যে তাকে বিয়ে করবার কথা ওঠে। তার তো একটা বিয়ে হয়েই গেছে।"

অনিলা নাছোড়বান্দা। "একটা হলেই কি আরেকটা হতে নেই? সে তো কবে মরে গেছে। আমার ঠাকুরদা পর-পর তিনটে বিয়ে করেছিলেন। আরো একটা করতেন কিন্তু ঠিক সেই সময়ে মরে গেলেন।"

মন্দিরা বুঝলে এবার প্রসঙ্গ পরিবর্তনের প্রয়োজন। সে বললে, "তোর গানের ওস্তাদের কী করলি আজকে?"

"তিনি এসেছিলেন, এবং নেলিকে গান শুনিয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে। মাসিমা, মণিকা-মাসিমা, নেলি, তিনজনেই নাক সিঁটকে ছিলেন, কিন্তু শঙ্কর মহাখুশি! হাজার হোক পুরুষমানুষ তো, ওরা অত বাল্যলীলাটিলা মাইণ্ড করে না। তারপর ওস্তাদজি রাশি-রাশি সিঙাড়া কচুরি খেয়ে বিদায় নিলেন, নইলে আর সময় কাটত কি করে! ওঁরা যে চারটের সময় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।"

মাসিমা বললেন, "বিলিতী মতে চারটেই হল চায়ের সময়। আমরাও ছোটবেলায় তাই জানতাম। তোদের মেসোমশাইয়ের এখানে এসে দেখি সব আলাদা, চায়ের কোনো নির্দিষ্ট সময়ই নেই। যে যখন আসছে চা খাচ্ছে। রাতের খাওয়া কখনো হচ্ছে সাড়ে-আটটায়, কখনো বা সাড়ে-দশটায়। পুরোনো রাঁধবার লোক; অনেকটা তারই সুবিধে-অসুবিধে অনুসারে সব চলেছে। তিনটি বছর লেগেছিল আমার সব গুছিয়ে আনতে।"

অনিলা অবাক হয়ে বলে, "আবার গুছিয়ে আনতে গেলে কেন? ঐ তো বেশ ছিল। যখন-তখন যা-তা খাচ্ছি, যখন-তখন বেরিয়ে যাচ্ছি,

বাড়ি ফিরছি, স্নান করছি, শুতে যাচ্ছি।" কী মনে পড়াতে আবার বলে, "অবিশ্যি মিলিদের বাড়ির মতো ব্যবস্থাও ভালো। সব ঘড়ির কাঁটার মতো হচ্ছে, কোনো অনিয়ম নেই, শব্দ নেই, ভালো মেসিনের মতো। সব পরিপাটি, সব সুন্দর; ঝাঁটা বা ঝাড়ন বা হাঁড়ি-খুন্তি চাকি-বেলুন কিছু চোখে দেখা যায় না। কিন্তু মিলি রান্নাঘরের খুব দেখা-শুনো করে।"

মন্দিরা বললে, "বাহবা! আপাতত কুৎসিত হাঁড়ি-কুড়ি ছেড়ে, খাবার জায়গায় যাওয়া যাক।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে শঙ্করের মা শঙ্করকে নিচু গলায় বললেন, "ইস! মন্দিরার সে রূপ একেবারে জ্বলে গেছে। কেমন একটা রুক্ষভাব দেখলি না?"

শঙ্কর সহসা মুখ তুলে মা'র মুখের দিকে চেয়ে বললে, "সে রূপও তো তোমার মনে ধরেনি।"

নেলি বিরক্ত হয়ে বললেন, "ইচ্ছে করে কেন ভুল বোঝ? তুমি খুব ভালো করেই জানো যে ওর চেহারার জন্যে আমি মোটেই আপত্তি করিনি। এখন রূপ জ্বলে গেছে; কিন্তু সে সময়ে, আমাদের মতো সুন্দরী না হলেও, ভালোই দেখতে ছিল। একটা কেমন কোমল নিষ্পাপ ভাব ছিল। দেখে মায়া লাগত।" শঙ্কর নীরব রইল দেখে অসহিষ্ণুকণ্ঠে আবার বললেন, "আমি কেন আপত্তি করেছিলাম সত্যিই কি তোমার মনে নেই? তখন তো মেনে নিয়েছিলে যে উচিত কথাই বলেছি। ওদের বংশ ভালো নয়। আমাদের সঙ্গে মিলবে না।"

শঙ্কর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, "কী বলছ মা, বংশ ভালো নয়। এই মাত্র শুনে এলাম ওদের দাদামশাইয়ের বাড়িতে তোমরা বহুবার অতিথি হয়ে থেকেছ।"

"ওর দাদামশাইয়ের কথা বলছি না, শঙ্কর। মাঝে-মাঝে মনে হয় তুমি ইচ্ছে করে আমাকে ভুল বোঝ। নির্মলার সেরকম উপযুক্ত ঘরে বিয়ে হয়নি। মন্দিরাদের মামার বংশ খুব ভালো। আমি বাপের বংশের কথাই ভেবেছিলাম—একটা নামডাকওয়ালা মানুষ নেই ওদের গোষ্ঠিতে। কেউ চেনে না ওদের, পরিচয় বলতে কিছু নেই। আমার একমাত্র ছেলের এমন জায়গার বিয়েতে আমার আপত্তি করাটা কি খুব আশ্চর্যের বিষয়? পাটনায় এমন একটা লোক ছিল না যার কাছে ওর বাবা কোনো না কোনো সময়ে টাকা ধার করেননি। লোকে হাসত ওখানে বিয়ের সম্বন্ধ হলে। এসব কি তোমার কাছে কিছু নয়? তখন তো বেশ স্বীকার করে নিয়েছিলে। এতই যদি তোমার মনে ছিল তো করলে না কেন বিয়ে।"

শঙ্কর বললে, "বিয়ে করলেই তো আর হল না। তুমি তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না বলেছিলে। বাবা গোলমাল দেখে সুড়সুড় করে ক্লাবে যাচ্ছিলেন। চেপে ধরতে বললেন তোমার অমতে কিছু হবে না। আমি নিজে তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছি। তিনবছরের ট্রেনিং, মাত্র দেড়শো করে পাব ততদিন। আমারই তাতে কুলোয় না, বউ পুষব কী করে?"

"দেড়শো টাকায় বহুলোকে পরিবার প্রতিপালন করে। তেমন মনুষ্যত্ব থাকলে তুমিও পারতে।"

শঙ্করের পিঠে কে যেন চাবুক মারল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এ কথা কি সে বহু বহুবার নিজের মনকে বলেনি? এবং মন বলেছিল, "বহুলোকে পারলেও তুমি পারবে না। তুমি শৌখিন মানুষ। তোমার ভালো জামা-জুতো, খাওয়া-দাওয়া, গাড়ি, ক্লাব, টেনিস, পার্টি, সব কিছুর শখ আছে। ও তোমাকে দিয়ে হবে না। দুদিনে ভালোবাসায় ভাঁটা পড়বে, তখন সারা জীবন অনুতাপ করে কাটাতে হবে।"

ক্লান্ত কণ্ঠে শঙ্কর বললে, "না, মা, যাতে কোনো কষ্ট করবার ক্ষমতা না জন্মায়, সে ব্যবস্থা তুমি ছোটবেলা থেকেই করে রেখেছিলে।"

"আর ভালো লাগে না, শঙ্কর। তুমি যাতে সুখী হও তাই কোরো।

আর আমি কিছু চাই না। এখনো তো মন্দিরাকে বিয়ে করতে পার। তার মতো মেয়ের পক্ষে, তোমার মতো হাজার টাকা মাইনেওয়ালা ছেলে পাওয়া তো সৌভাগ্য। বল তো আমিই সম্বন্ধ করি। তারপর আমার ছুটি। নিত্যি আর গঞ্জনা সইতে পারি না।"

ঠান্ডাভাবে শঙ্কর বললে, "আর হয় না, মা। যে মন্দিরাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, সে আর নেই। এ একজন অপরিচিত মেয়ে, এর ধারালো মনের কাছে আমি দাঁড়াতেই পারব না। আর ঐ ধরনের মেয়েরা কখনও দুবার ধরা দেয় না, এটুকুও বোঝ না, মা?"

ততক্ষণে নেলির বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গেছে, শঙ্কর আর কিছু বলবার অবকাশ পেল না। মাকে ধরে বসবারঘরের বড় সোফায় শুইয়ে দিতে হল। দুই দিক থেকে পিসিমারা দুজনে ছুটে এলেন। "ও কী হল নেলি? অমন কচ্ছিস কেন?"

"আর কেন, বড় পিসিমা, সোনা পিসিমা, এবার আমি গেলেই হয়। কীই বা লাভ বেঁচে থেকে, ওঁর আর কদিনই বা, ছেলেরও আর আমাকে দিয়ে প্রয়োজন নেই, আমি এখন যাবার জন্যই পা বাড়িয়ে রয়েছি।"

পিসিমারা তাই শুনে কেঁদে আকুল। শঙ্করকে যা নয় তাই গঞ্জনা দিয়ে বললেন, "তবে আর আমরা বুড়োমানুষরা বেঁচে আছি কেন? ওরে শঙ্কর, লক্ষ্মীছাড়া, মাকে যে পদে-পদে এত আঘাত দিস, মা গেলে তখন বুঝবি কি জিনিস হারালি!"

অগত্যা শঙ্কর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

পরদিন ব্রজসুন্দরের সঙ্গে অনিলার দেখা হল। সকালবেলার রোদে অনিলা শখের বাজার করতে বেরিয়েছে, ফিরবার সময়ে আর ট্রামে-বাসে উঠতে পারে না, মন্দিরার মতো জবরদস্ত নয় সে, ভিড় দেখলে ভয় পায়।

পাশে এসে ব্রজসুন্দরের নতুন গাড়ি দাঁড়ায়। কোমল বাদামী রঙের গাড়ি, শাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ব্রজসুন্দর স্টিয়ারিং ধরে বসে। সত্যিই সে গাড়ি চালাতে শিখেছে। মৃদু হেসে অনিলার জন্য দরজা খুলে দেয়। অনিলা নিঃসংকোচে তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে বসে।

"কী সুন্দর গাড়ি, ব্রজসুন্দরবাবু। আচ্ছা, আপনি কোট-প্যাণ্ট পরেন না কেন? কক্ষনো পরেন না?"

ব্রজসুন্দরকে স্বীকার করতে হয় যে মাঝে-মাঝে বিলিতী পোশাকও পরে সে। আগে কখনো পরেনি। তবে বিলেত গিয়ে অভ্যাস করতে হয়েছিল। তখন প্রশ্নের চোটে অনিলা তাকে বিব্রত করে তোলে। প্রসন্ন-মনে ব্রজসুন্দর উত্তর দিয়ে যায়।

"আপনার বয়েস কত?"

"পঁয়ত্রিশ বছর।"

"আরে বাপ! কবে বিলেত গিয়েছিলেন?"

"এম-এ পাশ করবার এক বছর পরে, আজ এগারো বছর হল।"

"মণিকা-মাসিমা ভেবেই পান না, কেন আপনি বিলিতী উপাধি ব্যবহার করেন না।"

"এবার উনি বেশি চিন্তাগ্রস্ত হলে, বলো এমনিতেই আমি এত অ্যাট্রাক্‌টিভ্‌ যে আরো বেশি হয়ে বিপদে পড়তে চাই না।"

অনিলা হেসেই কুটিপাটি। "নিশ্চয় বলব। একদিন কোট-প্যাণ্ট পরে আমাদের বাড়ি যাবেন কিন্তু, আমি শঙ্করকে ডেকে পাঠাব, দেখব কে বেশি ভালো দেখতে।"

ব্রজসুন্দরের গাল একটু লাল হয়ে ওঠে। জিগগেস করে, "শঙ্কর কে?"

"তা হলে যে অনেক কথা বলতে হয়। ও আর ওর মা আমাদের দোতলার ভাড়াটেদের বাড়িতে দুমাসের জন্য এসেছে, ওদের আত্মীয় কিনা। সাত বছর আগে ও আর দিদি বিয়ে ঠিক করেছিল, কিন্তু ওর

মা এমনি ছোটলোক যে কিছুতেই বিয়ে হতে দিলেন না, আমার বাবা বেচারা যথেষ্ট বড়লোক নয় বলে। খুব জব্দ হয়েছেন, ছেলের আজ পর্যন্ত বিয়েই হয়নি। এখন আবার আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে-ছিলেন, কে জানে মত বদলেছে কি না।"

ব্রজসুন্দর রৌদ্রস্নাত রাজপথের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে, কোনো কথা বলে না। অনিলা একটু আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আরও বলে, "দিদি বলে যে শঙ্করের কথা নাকি ওর মনের মধ্যে থেকে মুছে গেছে। তা কি কখনো হয়? ওটা নিশ্চয় রাগের কথা। কী ভালো যে দেখতে শঙ্কর, কেমন স্মার্ট, হাজার টাকা মাইনে পায়, দিল্লিতে থাকে, সেখানে নিজের বাড়ি আছে। ও কি কারো মন থেকে মুছে যেতে পারে কখনো?"

ব্রজসুন্দর নীরব থাকে।

অনিলাদের বাড়ির সুমুখে গাড়ি থামে।

"চলুন না, ব্রজসুন্দরবাবু, আমরা নিষ্কর্মারা একটু গল্প করি, দিদি আপিসে খাটুক।"

ব্রজসুন্দর মাথা নাড়ে, "না অনিলা, আজকে নয়। সত্যি কথা বলতে কি তুমি ব্যস্তবিকই নিষ্কর্মা, আমি মোটেই নই। আরে, আমাকে যে রোজ কোর্টে যেতে হয়, আমি যে দস্তুরমতো নাম লেখানো উকিল মানুষ। শঙ্করের মতো না হলেও, আমাকে কি একটা যে-সে ঠাউরেছ নাকি?"

অগত্যা ব্রজসুন্দরকে ছেড়ে দিতে হয়।

গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের উপর ব্রজসুন্দরের গৌরবর্ণ হাতখানি দৃঢ় মুষ্টি ধারণ করে। মন বলে, হায় ব্রজসুন্দর, একে ঈর্ষা বলে। একে তুমি কখনো উপভোগ করনি। দেখ এর কত সুখ, বুকের ভিতর তোমার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, দৃষ্টি তোমার মরুভূমির মতো হয়ে যায়। অধরে তোমার অমৃতফল বিষফলে পরিণত হয়।

ব্রজসুন্দর অনাবশ্যক বেগে গাড়ি চালিয়ে আদালতে উপস্থিত হয়। সন্ধ্যার আগেই সে বাড়ি ফিরে আসে। অসুস্থ বোধ করে। নন্দিনীকে দেখতে যায়।

বাগানের মাঝখানে নক্সা-আঁকা মাদুর বিছিয়ে আয়া নন্দিনীকে বসিয়ে দিয়েছে। নিজেও পাহারায় বসেছে, নন্দিনী আজকাল স্থির হয়ে বসে না। ব্রজসুন্দরকে তারা সাধ্যমতো অভ্যর্থনা করে।

ব্রজসুন্দর নন্দিনীকে অন্যমনস্কভাবে একটুখানি আদর করে চলে যাবার উপক্রম করে। নন্দিনী দুই হাত বাড়িয়ে কাঁদে। ব্রজসুন্দর তাকে বুকে তুলে নিয়ে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে, সে তার ছোট চাঁপার কলির মতো আঙুল দিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে। কী যেন হয় ব্রজসুন্দরের, হৃদয় মন্থন করে নিদারুণ কোমলতা কণ্ঠ রোধ করে দেয়।

দাসীর কোলে নন্দিনীকে নামিয়ে ব্রজসুন্দর ঘরে যায়। সুরেন মুখ ধোবার জল এনে দেয়, ফরসা কাপড়-জামা এনে দেয়, চা-জলখাবার এনে দেয়। নয়নতারা চলে গেছেন, মণিমালা চলে গেছে, ব্রজসুন্দরের ভৃত্যসম্প্রদায় প্রভুর জন্যে করুণায় বিগলিতচিত্ত। যত্নের তার ত্রুটি হয় না। কিন্তু যে তৃষ্ণা কেউ দূর করতে পারে না, তা অহরহ মনকে ক্লিষ্ট করে। ব্রজসুন্দর বই হাতে অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মির দিকে চেয়ে থাকে।

সুরেন এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়। কে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। ব্রজসুন্দর কিছু বলবার আগেই একরাশি রুক্ষ কোঁকড়া চুল নিয়ে, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশকায় খর্বদেহ একটি লোক ঘরে প্রবেশ করে।

ব্রজসুন্দর নমস্কার করে সংক্ষেপে জিগগেস করে, "কে আপনি? আমি কিছু করতে পারি?"

"তা পারেন বৈ-কি, আপাতত আপনার নাম, জন্মতারিখ, পেশা ও আদি বাসস্থান বলতে পারেন।"

ব্রজসুন্দর হেসে বলে, "আপনি কি পুলিশের লোক? কোনো

অন্যায় কাজ করে ফেলেছি বলে আমাকে জেরা করতে এসেছেন?"

দরজার কাছ থেকে সুরেন বলে ওঠে, "না বাবু, উনি টিকটিকি। পুলিসের লোক নন। বলেন তো ওনাকে বের করে দিই।"

"তুমি এখন যেতে পার, সুরেন। দরকার হলে ডাকব, এ দিকেই থেক।"

সুরেন দরজার ঠিক বাইরেই খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে।

"ওর কথা ভুলে যান, পুরোনো চাকর কিনা, একটু বেয়াদব হয়ে গেছে। বলুন কী করতে পারি?"

লোকটি চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললে, "দেখুন স্যার, আমাদের কাজে কারো কথায় কিছু মনে করবার উপায় নেই। গত হপ্তায় এক-জনের কাছে গলাধাক্কা পর্যন্ত খেতে হয়েছে। ও আমরা মাইন্ড করি না। ঐ হল গিয়ে আমাদের চাকরি। আচ্ছা—দাঁড়ান একটু দেখে নিই।" পকেট থেকে খুদে নোটবই বের করে পাতা ওলটায়।

"হ্যাঁ, এই যে। আচ্ছা গত মাঘ মাসের চোদ্দ তারিখে, রাত্রি নটার সময়, আপনি কোথায়, এবং কী অবস্থায় ছিলেন মনে পড়ে?"

ব্রজসুন্দর অবাক হয়ে যায় বলে, "কই, না তো।"

"আচ্ছা, আমিই আপনাকে একটু সাহায্য করছি। সেই সময়ে আপনি রসা রোডে ট্রাম থেকে নেমে, একটা গাড়িবারান্দার নিচে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোকের সঙ্গ নিয়েছিলেন কিনা?"

ব্রজসুন্দর হঠাৎ রেগে উঠে বলে, "সঙ্গ নিয়েছিলাম মানে? সেই বরং আমার পেছু নিয়েছিল। এমনি বিপদে ফেলেছিল যে সেদিন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত তার জের টানছি। আমি—"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দেখে যে লোকটি তার প্রতিটি কথা দ্রুতবেগে টুকে রাখছে। "ওর কী মানে হল?"

লোকটি মহাখুশি হয়ে নোট বই বন্ধ করে বললে, "তা হলে আপনি কোনো কিছুই অস্বীকার করছেন না?"

"কী কিছু অস্বীকার করব?"

"সেই মেয়েটির—তার নাম সাবিত্রী—সঙ্গে একটি তিনমাসের খুকি ছিল, তার হাতে সোনার বালা ছিল। আপনি কি অস্বীকার করছেন যে সোনার বালাসুদ্ধ সেই খুকিকে আপনি আপনার বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন?"

ব্রজসুন্দর ধৈর্য হারিয়ে ডেকে বললে, "সুরেন, এই লোকটাকে এখুনি আমার বাড়ির বাইরে পৌঁছে দিয়ে এস।"

ঝড়ের বেগে একজন সুন্দরী তরুণী মেয়ে এসে ব্রজসুন্দরের পায়ে পড়ে। "আমার অপরাধ নেবেন না। ও লোকটা বোকা, কার সঙ্গে কী বলতে হয় কিছু জানে না, ওর কথায় রাগ করবেন না। আমি শুধু একবার আমার মেয়েটিকে দেখে যেতে চাই।"

ব্রজসুন্দরের মনটা নিমেষের মধ্যে হালকা হয়ে গেল। তবে তো মা একেবারে হৃদয়হীনা নয়।

"আসুন, আসুন আমার সঙ্গে।"

সন্ধ্যা নেমে এসেছে, আয়া নন্দিনীকে ঘরে নিয়ে এসেছে। দুজনে সেখানে উপস্থিত হয়।

ছোট্ট মেয়ে নন্দিনী শাদা বালিশের উপর একরাশি কালো কোঁকড়া চুল এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মুদিত নয়ন দুটি পদ্মপাপড়ির মতো, ঠোঁট দুখানি দোপাটি ফুল, হাতের মুঠি খোলা, একান্ত অসহায়। ব্রজসুন্দর চেয়ে দেখলে নন্দিনীর রূপসী মায়ের দুই চোখ থেকে অশ্রু-ধারা গড়িয়ে পড়ছে, কাজল ধুয়ে যাচ্ছে, গালের গোলাপী রঙ ধুয়ে যাচ্ছে। লিলি ফুলে কেন রাংতা জড়ায়? ঠোঁট কাঁপছে, কুন্দফুলের মতো দুটি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরতে হচ্ছে।

ব্রজসুন্দর কোমল কণ্ঠে বললে, "নিজের মেয়ে কি কখনো অচেনা লোককে দিয়ে দিতে হয়।"

তেমনি নিচু গলায় মেয়েটি বললে, "কত দুঃখে দিয়েছিলাম যদি

আপনি জানতেন।" তারপর ত্রস্ত চোখ তুলে বললে, "ওকে আমি নিয়ে যেতে আসিনি। ওকে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। শুধু একবার দেখতে এসেছি, দেখে চোখ জুড়োতে এসেছি।"

ঘুমন্ত মেয়ের চুলে আলগোছে একটি চুমো খেয়ে ধীরে-ধীরে ঘর থেকে সে চলে আসে।

"আপনার মতো দয়ালু মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। ডিটেকটিভ লাগিয়ে আপনার খোঁজ পেলাম, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার মতো হতভাগিনীর প্রার্থনার কোনো ফল হয় কিনা জানি না, তবু প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘজীবী হোন, সুখী হোন।"

বিদায় নিতে গিয়ে যেতে যেন আর পারে না। কী বলতে গিয়ে বলতে পারে না।

বজ্রগম্ভীর স্বরে ব্রজসুন্দর বলে, "যখনই দেখে যেতে ইচ্ছে হবে, দেখে যাবেন। আমার লোকজনদের বলে দেব, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।"

মেয়েটি চোখে আঁচল তুলে দ্রুতপদে গেটের বাইরে অপেক্ষমান ফিটন গাড়িতে উঠে পড়ে। গেটের পাশের ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রোগা ডিটেকটিভটা একগাল হেসে নমস্কার করে বলে, "কিছু মাইন্ড করবেন না, স্যার। জানেন তো পেটের দায়ে অনেক কিছু করতে হয়।" তারপর কাছে এসে কানে-কানে বলে, "কেয়ারফুল থাকবেন, স্যার। লেডি নেক্সট ডোর। কৌতূহল রাখতে পাচ্ছেন না।"

ব্রজসুন্দর পাশের বাড়ির দোতলার জানলার দিকে তাকিয়ে দেখল মিস লাহিড়ী ছায়ার মতো অপসারিত হয়ে গেলেন।

হেসে প্রতিনমস্কার করে সে ডিটেকটিভকে বললে, "ও কিছু নয়, আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

ফিটন গাড়ির চাকার শব্দ আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল।

শোবার পর ব্রজসুন্দর কল্পনা করতে চেষ্টা করে শঙ্কর কেমন

দেখতে। নিশ্চয়ই ছফুট লম্বা, কালো কোঁকড়া চুল কপাল থেকে তুলে আঁচড়ানো। ব্রজসুন্দরের চুলও মন্দ নয় তবে একটু যেন পাতলা হয়ে এসেছে, একটা-দুটো করে পেকেও যাচ্ছে।

ধনুকে জ্যা যোজনা করলে যেমন হয় তেমনি ধারা দেহ বোধহয় শঙ্করের। ব্রজসুন্দরের আদুরে শরীর মুগুর ভাঁজার দরুন একেবারে অথর্ব না হলেও, ধনুকের ধার পাশ দিয়েও যায় না। তবে শঙ্করের গায়ের রঙ কখনোই তার চেয়ে ফরসা নয় একথা ভেবে খুশি হল সে।

কী যেন বলেছিল অনিলা—খুব স্মার্ট শঙ্কর, হাজার টাকা মাইনে পায়। ব্রজসুন্দরও নিতান্ত দীনহীন নয়, তবে খুব স্মার্ট বলে কি আর চালানো যায়? তবে পড়াশুনা করেছে সে অনেক, নিশ্চয়ই শঙ্করের চেয়েও বেশি। ব্রজসুন্দর সোজা হয়ে উঠে বসে, মনকে বলে, কাপুরুষরাই যুদ্ধের আগে পরাজয় স্বীকার করে।

তিন মাইল দূরে শঙ্করও নিদ্রাহীন রাত্রি কাটায়। সকল জ্বালার বড় জ্বালা বিবেকের দংশন। এতদিন নিজেকে করুণা করে এসেছে, ভেবেছে সবই মা'র দোষ, মা-ই আমার সুখ নষ্ট করে দিয়েছেন। আজ মন্দিরার উদাস তীক্ষ্ন দৃষ্টি দেখে বারবার মনে হয়েছে সত্যিই কি মা'রই সব দোষ, নিজের কি কোনো দায়িত্ব ছিল না?

সাত বছর আগে মন্দিরাকে শেষ চিঠিতে কি লিখেছিল মনে করতে চেষ্টা করে। মন্দিরা সে চিঠির উত্তর দেয়নি। কীই বা উত্তর সে দেবে? শঙ্কর তাকে প্রত্যাখ্যান করে, কাঁদুনি গেয়ে চিঠি লিখেছে, সে কি শঙ্করের পা জড়িয়ে ধরে বলবে, "আমাকে ত্যাগ কোরো না, আমি তোমা বিহনে বাঁচব না!" মন্দিরা কারো পা জড়িয়ে ধরে না, কারো জন্য মৃত্যু বরণ করে না। কিন্তু এ মন্দিরা তো শঙ্করের বহু ভালোবাসার সে মন্দিরা নয়। এ আরেকজন। এর বয়েস শঙ্করের চেয়ে কম হলেও, শক্তি ঢের বেশি। বরং অনিলাকে দেখে সেই পুরোনো মন্দিরার কথা তার মনে পড়ে।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৯ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

দোতলার ভাড়াটেদের বাড়িতে চায়ের আসর জমে ওঠে। অবিশ্যি ভাড়াটেদের অনুপস্থিতিতেই শঙ্করের মা ফিকে নীল রঙের পাড়হীন শাড়ি পরে নাক সিঁটকে কম দামের প্লেট পেয়ালাগুলিকে দেখেন।

"কী করা যায়, হেমনলিনী? এদের জীবনযাত্রায় ললিতকলারই কোনো জায়গা নেই, তা ভালো বাসন কিনবে কখন? চারদিকে তাকিয়ে দেখ, দিব্যি বাড়িখানি করেছিলেন তোমার স্বামী, কিন্তু তার ছিরিখানি একবার দেখ। ঝাঁটপাট দিয়ে, ঝেড়ে-মুছে রেখেছে বটে, কিন্তু ঘর-দোরগুলিকে সুন্দর করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। আসবাবগুলোকে দেখ একবার!"

শঙ্কর একটু লজ্জিত হয়ে বলে, "কী যে বল মা, সকলকেই যে তোমার পছন্দ মতো চলতে হবে তার কোনো মানে নেই। ঘর সাজাবেন না সাজাবেন সে তাঁদের খুশি। তুমিই কি তাঁদের মতামত নিয়ে চল?"

মন্দিরার মনটা একটু খুশি হয়ে যায়।

মাসিমা চারিদিক মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করেন, কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেন না। আটপৌরে পেয়ালা-পিরিচ অযত্নে কোলের উপর নামিয়ে রাখেন। সব বাজারের খাবার, কেই বা ঘরে খাবার করবে? শঙ্করের মা'টি তো চিরকাল একটি পটের বিবি, বুড়ি বেচারীদের পক্ষেও ও-কাজ সম্ভব নয়। বাজারের খাবার মাসিমার সহ্য হয় না, সাবধানে পাতলা এক স্লাইস কেক বেছে নেন।

কেমন করে যেন মণিকা-মাসিমাও নিমন্ত্রণের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। আগাগোড়া শাদা পোশাক পরেছেন, পায়ে শাদা জুতো, হ্যান্ড-

ব্যাগও শাদা—মণিকা-মাসিমার ফরসা রঙের সঙ্গে ভারি মানিয়েছে এ বেশভূষা। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "আহা হেমনলিনী, তোমার লতানে গোলাপটি মরে গেছে বুঝি? খালি টবটা দেখে কেমন যেন লাগছে।"

বুড়ি পিসিমাদের একজন বললেন, "বড্ড শুঁয়োপোকা হত কি না, তাই সুশীলা ওটাকে উপড়ে ফেলে দিয়েছে।"

মাসিমা চাপা গলায় বললেন, "আমাকে বললে, ডালপালা সুদ্ধ ওটা আমি নিচে নিয়ে যেতাম। ওটাকে একবার শীতের শেষে উনি লাগিয়ে ছিলেন। সবাই বলেছিল, ও গোলাপ এখানে হবে না। কিন্তু বছরে-বছরে কত যে রাশি-রাশি ফুল হত ঐ গাছে সে আর কী বলব।"

শঙ্করের মা সহানুভূতি প্রকাশ করেন, "ঐ তো বললাম, চাকরি-বাকরি করে টাকা আনে, খায়-দায়, বেড়ায়, ঘুমোয়, ভালো বইয়ের নাম শুনলে কিনে এনে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলে, নামকরা ফিলম এলে সময় করে দেখে আসে, ভিটামিন পিল খায়, মাসে একবার ওজন নেয়। গোলাপ ফুলের ওরা কী বুঝবে?"

শঙ্কর আবার বলে, "না, মা, এটা তোমার অন্যায়। তাঁদের মতো তাঁরা থাকেন। তুমি আসতে চাইলে খুশি হয়েই অনুমতি দিলেন। তোমার মতো তুমি থাকো, কোনো আপত্তি তো করেন না। এই নিয়ে খোঁটা দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া, বেশ তো আরামের ফ্ল্যাটখানি।"

"পুরুষমানুষরা দুবেলা পেট ভরে খেতে পেলে, নাকের ডগার বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে চেয়েও দেখে না। আমার মতে এরা আমাদের সঙ্গে খুব ক্যাজুয়াল ব্যবহার করেছে, খুব দায়সারা একটা ভাব। এমন জানলে আমি নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে এখানে অসুবিধে ভোগ করতে আসতাম না। আচ্ছা, এই চামচটার দিকেই তাকিয়ে দেখ না। হেমনলিনী, ভাই তোমার আতিথ্যের উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পারছি না, যদ্দিন না আমার নিজের বাড়িতে তোমরা আসছ। কিছু মনে কোরো না।"

শঙ্কর বিরক্ত হয়ে অনিলার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হয়। মন্দিরা জানলা দিয়ে দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে এমনি করেই গোটা জীবনটাই কেটে যায়। বহুদিন পরে শঙ্করের প্রতি একটু মমতা হয়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ব্রজসুন্দরের প্রসঙ্গ ওঠে। শঙ্করের সঙ্গে ব্রজসুন্দরের একটা পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছে, কোর্টের প্রাঙ্গনে। শঙ্করের ব্রজসুন্দরকে ভারি ভালো লেগেছে। নিজের ঠিকানা বলতে গিয়ে এ-বাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপের কথা প্রকাশ করেছে।

সহসা মিস লাহিড়ী বলে ওঠেন, "তুমি ছেলেমানুষ, ও লোকটার সঙ্গে নাই বা মিশলে, শঙ্কর। ও লোকটা দ্রুতপদে গোল্লায় যাচ্ছে। বুঝে-সুঝে বন্ধু-বান্ধব করতে হয়।"

শঙ্করের সুশ্রী মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে ওঠে, বলে, "কারো প্রাইভেট লাইফে আমার কৌতূহল নেই, মিস লাহিড়ী। লোকটিকে বেশ ডিসেণ্ট বলে মনে হল।"

"না জেনে কারো সম্বন্ধে কিছু হিণ্ট করা আমার স্বভাব নয়, যাক গে।" বলে মণিকা-মাসিমা অধরোষ্ঠ এমন চেপে বন্ধ করলেন যে অনিলা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। আবার ঠোঁট খোলা যাবে তো? প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যায়। অনিলা গান করে, সেইজন্য নিচের তলা থেকে হার্মোনিয়ম আনতে হয়। রাত্রি আটটা বাজল, বাড়ির মালিকদের প্রত্যাগমনের আগেই সভা ভঙ্গ করতে হয়।

নিচে এসে হেমনলিনী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, "তোমার মতামত দেখছি বাতাসের সঙ্গে বদলায় মণিকা। একদিন শুনি ব্রজসুন্দর দুষ্ট লোক, তারপর দিন বলবে, 'না সে ভালো, ওর দিদিই ওকে বোঝেন না।' আজ আবার পাঁচটা বাইরের লোকের সামনে বলে বসলে ব্রজসুন্দর গোল্লায় গেছে। লোকটি আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করেছে ওরা সে কথা জানে, কী ভাবল বল তো? তুমি কি চাও মেয়েদের বিয়ে-টিয়ে না হয়?"

মিস লাহিড়ীও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

"কেউ আমাকে কখনো ইরেস্পন্সিব্‌ল্‌ আখ্যা দেয়নি, হেমনলিনী। আমি নিজের চোখে দেখেছি ব্রজসুন্দরের মতিগতি ভালো নয়। একদিন নয়, তিন-তিন দিন নিজে দেখেছি রাত্তির করে, অদ্ভুত সব সুন্দরীরা ওর বাড়ি যাওয়া-আসা ধরেছে। ভালো মনে করে বলেছি, তোমাদের যদি ভালো না লাগে আর বলব না, আমার আর কী?"

শুনে অনিলা অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে, কিন্তু মন্দিরাকে দেখে মনে হয় যেন পাথরে খোদাই করা একটা মূর্তি।

অনিলা বললে, "বেশ লোক আপনি মণিকা-মাসিমা, কার বাড়িতে কে যাচ্ছে না যাচ্ছে সর্বদা সেই দিকেই চোখ। বেশ করে, সুন্দরীরা ওর বাড়ি যায়। পারলে আমিও যেতাম। খুব ভালো লোক ব্রজসুন্দর। বেচারির এতটা বয়েস হল, তবুও ওকে সন্দেহের চোখে দেখবেন! আপনারা যেন কী! ওরা হয়তো ওর পিসতুতো বোন কি পিসিমাও হতে পারেন, কি বৌদিরা হয়তো সহানুভূতি জানাতে এসেছে, খুকি নিয়ে ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন। সবটার খারাপ দিক দেখবেন কেন?" তারপর মন্দিরার দিকে ফিরে বলে, "দিদি, তুমিও তো বেশ, ব্রজসুন্দর-বাবু তোমারই বন্ধু, অথচ মণিকা-মাসিমা এমন একটা কথা বলে বসলেন আর তুমি তাই চুপ করে শুনলে?"

মন্দিরা অর্থহীন দৃষ্টিতে একবার অনিলার দিকে চেয়ে বললে, "সব কথাতেই অত উত্তেজিত হও কেন অনিলা?"

অনিলা পদ্মফুলের মতো হাত দুখানি প্রসারিত করে নিদারুণ হতাশায় বললে, "তোমার বন্ধুত্বের এক পয়সাও দাম নেই, দিদি, তুমি কারো জন্য কেয়ার করো না। আমার সবাইকে ভালো লাগে, শঙ্করকে, ব্রজসুন্দরকে—"

বাধা দিয়ে মণিকা-মাসিমা উঠে পড়েন, "উঠি হেমনলিনী। আমার উপস্থিতি আজকাল যখন এবাড়িতে এত অপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এই যাওয়া-আসা সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখতে হবে।"

মাসিমাও উঠে দাঁড়ান। "বাড়িটা ওদের নয়, মণিকা, এখনো পর্যন্ত আমার। আমার বন্ধুরা এখানে না এলে আমি দুঃখিত হব।"

মণিকা-মাসিমা চলে গেলে, মাসিমাও নীরবে নিজের ঘরে প্রবেশ করেন।

অনিলার দুই গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। "দিদি, সত্যি তোমার ওরকম শুনলে রাগ হয় না, দুঃখ হয় না?"

মন্দিরা অন্ধের মতো দুই হাত বাড়িয়ে অনিলাকে আলিঙ্গন করে। বলে, "দুনিয়াতে কত দুঃখ আছে রে অনিলা। কে কী বলল না বলল সে তো তুচ্ছ কথা।"

মাসিমা চায়ের সময় বিশেষ কিছু খাননি, নটা না বাজতে খাবার টেবিলে গরম লুচি তরকারি সাজিয়ে, মন্দিরা মাসিমাকে ডাকতে গেল। মাসিমা রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমার খিদে নেই, আমি খাব না মন্দিরা। তোমরা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।"

"সে কি মাসিমা? বিকেলেও কিছু খেলে না, এখনো খাবে না? শরীর খারাপ করেছে, না মণিকা-মাসিমার কথাতে মন খারাপ লাগছে? একটু কিছু খাও না, মাসিমা।"

আলো জেবলে দেখে মাসিমা চুল বেঁধে, হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়েছেন। মনে হয় চোখের পাতা যেন ভিজে। মন্দিরা কাছে এসে কোমল কণ্ঠে বলে, "একটু দুধ গরম করে এনে দিই, মাসিমা লক্ষ্মীটি, কিছু না খেয়ে শুয়ো না। তুমি অসুখে পড়লে আমি কিন্তু চালাতে পারব না বলে রাখলাম। আমি তা হলে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব।"

ম্লান হেসে মাসিমা দুধ খেতে রাজী হন। গেলাশটা মন্দিরার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, "এক রাত্রের স্বপ্নের মতো জীবনটা কেটে যায় মন্দিরা। শেষে একদিন শূন্য ঘরে বসে দেখি, হাতে কিছুই রেখে যায়নি। ওরা গোলাপগাছটা কেটে ফেলেছে বলে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, মন্দিরা।"

মাসিমার দুই গাল বেয়ে অনভ্যস্ত চোখের জল ঝরে পড়ে। মন্দিরা গেলাশ নামিয়ে রেখে, কাছে এসে মাসিমার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। তার নিজের চোখও ঝাপসা হয়ে আসে। "মুখে কিছু বলতে পারি না, মাসিমা। কিন্তু শূন্য ঘরে খালি হাতে বসে থাকবে কেন মাসিমা, আমি বেঁচে থাকতে? তুমিই তো আমাকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছিলে, সে কথা আমার মনে আছে।"

মন্দিরা ফিরে এলে অনিলা বললে, "ভাগ্যিস, উপরে গিয়ে এত-গুলো বাজারের ডালপুরি আলুরদম সাঁটিয়েছিলাম, দিদি, নয়তো এতক্ষণ গরম লুচির সামনে বসে একেবারে হেদিয়ে যেতাম। মাসিমা কি খুব রাগ করেছেন, মণিকা-মাসিমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছি বলে?"

"কই, না তো। সে কথা তো কিছুই বললেন না। রাগ করেননি। তবে মেসোমশাইয়ের অত শখের গোলাপগাছটি ওরা কেটে ফেলেছে দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে, পুরোনো দিনের কথা সব মনে পড়ছে।"

"ফানি! না, দিদি? মানুষের উপর এত কম টান, অথচ গাছের জন্য শোক করছেন।"

"ওকথা তুই বলিস না। তোর উপর যথেষ্ট টান আছে। আর তুই বিশ্বাস করিস বা নাই করিস, আমাকে ভালোবাসেন তোর চেয়েও বেশি।"

"ইস! বললেই হল। ঐ লাল লুচিটা আমি খাব, দিদি।"

আবার আরেকটা দিনের অবসান হয়। এমনি করে দন্ডে-দণ্ডে পলে-পলে অনন্তকাল সম্পন্ন হয়। মন্দিরার বুকের ভিতর দৃঢ় লোহার বাঁধনের মতো কি একটা যেন চেপে বসেছে। দুই চোখ জ্বালা করে, কিছুতেই ঘুম আসে না। অনিলার ক্লান্ত মাথা বালিশ স্পর্শ করবামাত্র

সে ঘুমে নেতিয়ে পড়ে। তার প্রাণে এখনো জগতের ছায়া পড়েনি।

পরদিন সারাদিন বৃষ্টি পড়ে। মন্দিরার ছুটি, দুই বোনে বাড়িটাকে আগাগোড়া গুছোতে বসে যায়। খনার মা'ও নিজে থেকে কাজে লাগে। ন্যাপলাকে ভাতে-ভাতের ব্যবস্থা করতে বলে কোমরে কাপড় জড়িয়ে, ঝাঁটা হাতে পাশে এসে দাঁড়ায়। উৎসাহ একটা সংক্রামক ব্যাধি, ন্যাপলাও তাই যেমন-তেমন করে ভাত নামিয়ে রেখে, ঝুল ঝাড়তে শুরু করে দেয়, কারো স্নান-খাওয়ার ঠিক থাকে না।

দুপুরে মন্দিরা একথান সোনালি কাপড় বের করে পর্দা সেলাই করতে বসে। সন্ধ্যার আগে সেই পর্দা বসবারঘরের দরজায়-জানলায় টাঙানো হয়। অনিলা হাত-মুখ ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে, মন্দিরার বাগান থেকে রাশি-রাশি ভিজে ফুল নিয়ে আসে। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিতে বাগান আলো হয়ে আছে।

ফুল সাজিয়ে, কোঁকড়া চুলগুলি নেড়ে অনিলা বললে, "আজ কেউ এলে বেশ হত। না, দিদি?"

দরজায় মৃদু করাঘাত করে শঙ্কর আসে।

অনিলা খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে। "এসো শঙ্কর, তোমাকে গান শোনাই। আজ আমাদের মনটা বড় ভালো লাগছে।"

মন্দিরাও হেসে বলে, "আজ ঘর-দোর আমরা সাজিয়েছি দেখছ? তুমি না এলে নিজেরাই বসে দেখতাম।"

মাসিমাও প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, "দেখছ তো ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা কত বেশি কাজ করে।"

শঙ্কর উৎসাহের সঙ্গে বলে, "ওঃ, ঢের বেশি, তারা দেখতেও ঢের ভালো।"

বেশ কাটে সন্ধ্যেটা।

রাত্রে শোবার সময় অনিলা বলে, "দিদি জানো, ব্রজসুন্দরবাবু এসেছিলেন। শঙ্কর বেরিয়ে যাবার সময় দোরগোড়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা।

শঙ্কর কী করল, জানো? ব্রজসুন্দরবাবুকে ধরে উপরে নিয়ে গেল। বলল এদের বাড়ি কেন আসেন? আপনার অসাক্ষাতে এরা আপনার নিন্দা-মন্দো করে। চলুন উপরে, বলছি সব কথা। আর ব্রজসুন্দরবাবুও তেমনি। যেই না বলা অমনি সুড়-সুড় করে ওর সঙ্গে উপরে চলে গেলেন।"

মন্দিরা কোনো উত্তর দিল না। শুনল কিনা বোঝা গেল না। হঠাৎ হাতের উপন্যাসখানি নামিয়ে রেখে অনিলা বললে, "আমার খুব ইচ্ছে হয় আমার জীবনেও একটি বড় রোম্যান্স হোক, হয় সুখের সপ্তম স্বর্গে চড়ে যাই, নয় তো হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাক, অকালে একদিন চাঁদের আলোতে মরে যাই।"

মন্দিরা না হেসে পারে না।

অনিলা বই নামিয়ে রেখে দেয়। "সত্যি দিদি, শঙ্করকে আর তুমি ভালোবাস না। আমি হলে কিন্তু পারতাম না। আগে কী রকম যেন আদুরে মতো ছিল, এখন মাকে পর্যন্ত কেমন দাবড়ি দেয় দেখলে তো? আমার ঐ রকম ভালো লাগে। দস্তুরমত ভালো অবস্থাও ওদের। তোমার পছন্দ বলে কোনো জিনিসই নেই, তুমি কোনো কর্মের নও। ইস—আমি হলে—"

অনিলা ঘুমিয়ে পড়ে।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

গ্রীষ্মের ছুটি আগতপ্রায়, শান্তিনিকেতনের ছাত্রী নিবাসের মেয়েরা বাড়ি যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে, বাক্সপ্যাঁটরা গোছাবার ধুম লেগেছে কিন্তু মণিমালার মনে ঘোর অশান্তি।

ব্রজসুন্দর লিখেছে খবরদার ছুটিতে মা'র কাছে ভাগলপুরে যেয়ো না, কারণ দিদি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছে, তোমার কোন খুড়ির ভাইয়ের সঙ্গে। বরং আমার এখানে এস, নন্দিনী কত বড় হয়ে গেছে দেখবে। চলতে চেষ্টা করছে। ভাবছি একটা রেফ্রিজারেটর কিনে ফেলব, গরমকালে রোজ আইসক্রীম খাওয়া যাবে, ইত্যাদি।

ঘোর দুর্নীতিতে পূর্ণ চিঠি। মণিমালাকে যুগপৎ শঙ্কিত এবং লুব্ধ করবার উদ্দেশ্যে কৌশল করে লেখা। আইন ঘেঁটে-ঘেঁটে ব্রজসুন্দরের চুলে পাক ধরে গেল, মানব চিত্তের আর কিছুই অজানা রইল না, দিদির উপর বেশ এক চাল দেওয়া গেল। এবার মণিমালাকে কেমন করে ভাগলপুর নিয়ে যায় দেখা যাবে।

নয়নতারা আবার তাকে লিখেছে : মা মণি, এ পৃথিবীতে তুই ছাড়া আমার যে কেউ নেই, তোকে ছেড়ে অবধি কমাস এ কথা বুঝতে পারছি। শরীরটাও যেন কেমন ভেঙে পড়েছে। কথায়-কথায় হাঁপ ধরে যায়। তুই সুখী হ মা, তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। ছুটির দিনগুলি এখানে কাটিয়ে তোর মাকে সুখী করিস। কি জানি, আজকাল প্রায়ই মনে হয় আমারও বোধহয় হয়ে এল। তোর বাবাকে কি মনে পড়ে, মা?

ইতি—আঃ তোর মা।

এমনধারা বুদ্ধিমতী নারীর সঙ্গে ব্রজসুন্দর পারবে কেন? মণিমালা

শেষ পর্যন্ত মামাকে চার পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি চিঠি লিখে, উদ্বিগ্ন মনে ভাগলপুর যাত্রা করল।

গ্রীষ্ম এসে জলে-স্থলে তার শুষ্ক আসন পেতে বসে। ব্রজসুন্দরের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। প্রতি বছর এই সময়ে নয়নতারার হাতে বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে সে সিমলা-দার্জিলিং বেড়িয়ে এসেছে নিশ্চিন্তমনে। কোনো জিনিস যে বন্ধ করতে হয়, ঘরের দরজায় যে তালা লাগাতে হয়, কাপড়-চোপড়ের যে হিসেব রাখতে হয়—এ অভিজ্ঞতা তার আজ পর্যন্ত হয়নি।

একদিন সোনার হাতঘড়িটি হারিয়ে গেল। আয়নার সামনে থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না। পুরোনো ঘড়ি হারানোর স্বাভাবিক দুঃখের চেয়েও পুরোনো চাকরকে সন্দেহ করার দুঃখ ব্রজসুন্দরকে বেশি পীড়া দিতে লাগল।

সুরেনও ক্ষুব্ধচিত্তে বার-বার অনুপস্থিত নয়নতারাকে সাক্ষী মানতে লাগল, নবাগতা আয়া বাক্স গুছিয়ে চলে যাবার জন্য একরকম প্রস্তুত হয়েই রইল, ঠাকুর এসে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটি দাবী করল। সন্ধ্যার দিকে নন্দিনীর অল্প জ্বর এল। ব্রজসুন্দর উপলব্ধি করল তার ছুটির দিনের অবসান হয়েছে। এতদিন কারো কাছে ছুটি প্রার্থনা করতে হয়নি, কোর্ট খোলা থাকা বা না থাকা দুই-ই তার কাছে সমান ছিল, প্রসঙ্গ উত্থাপন করামাত্র নয়নতারা আনন্দের সঙ্গে যাত্রার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আজ মনে পড়ল যে গ্রীষ্মের ছুটিতে নয়নতারা কখনো পাহাড়ে বেড়াতে যেতে চায়নি। ব্রজসুন্দর চলে গেলে মণিমালাকে নিয়ে বাড়ি সে আগলে থেকেছে। এই ব্যবস্থাতেই ব্রজসুন্দর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, প্রতিবাদ করবার কথা মনেও হয়নি। প্রতি বছর পুজোর সময় বন্ধুরা মিলে পশ্চিমে বেড়াতে গেছে, বাড়ির ব্যবস্থা নিয়ে ব্রজ-সুন্দর মাথা ঘামায়নি, নয়নতারা যা ভালো মনে করেছে, তাই করেছে।

নাঃ, নয়নতারার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞ থাকলেও মনে কোনো দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। ব্রজসুন্দর উঠে পড়ে নন্দিনীকে এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাইয়ে দিল। জ্বরভারাক্রান্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে নন্দিনী তার চলাফেরা অনুসরণ করতে লাগল, উঠবার জন্য আজ আর কোনো আবদার করল না।

ব্রজসুন্দরের মন খারাপ হয়ে গেল। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কিছু-দিনের জন্য মুক্তি অন্বেষণের পথের অন্তরায় যে নয়নতারা নয়, বরং নন্দিনী, একথা সে মনে-মনে অস্বীকার করে, নয়নতারার উপর মনে-মনে একটা অযৌক্তিক অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করতে চেষ্টা করল।

সেদিন ভাবল একবার অনিলার গান শুনে আসি, মন্দিরার প্রশান্ত মুখখানি দেখে আসি। অনেক দিন যাওয়া হয়নি। শঙ্করের কথাও মনে পড়ল। শঙ্করকে ব্রজসুন্দরের ভালো লেগেছিল। শঙ্করের মধ্যে কোথায় একটা তারুণ্যের রহস্য লুকোনো ছিল, যা দেখে ব্রজসুন্দরের মন মুগ্ধ হচ্ছিল, যদিও তার নিজের জীবনে তা সম্পূর্ণ অপরিচিত। শঙ্কর নিশ্চয় আনন্দ হলে নেচে ওঠে, খুশি হলে হেসে আকুল হয়, দুঃখ হলে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, অভিমান হলে গাল ফুলোয়, রাগ হলে চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়, কথা নিশ্চয় অসংযত হয়ে পড়ে। দুজনের বয়েসের ব্যবধান মাত্র তিন-চার বছরের হলেও সেটা কত যে অলঙ্ঘ্য ব্রজসুন্দর সেকথা উপলব্ধি করল।

ভাবতে-ভাবতে ব্রজসুন্দরের গাড়ি মন্দিরাদের বাড়ি পৌঁছে গেল।

মন্দিরাদের বাড়িতে আজ হাট বসেছে। মন্দিরার মা গুটি তিনেক ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে নিয়ে কিছুদিনের জন্য এসেছেন। অল্প দামের রেশমী শাড়ির অন্তরালে কর্মক্লিষ্ট ক্লান্ত হাত দুখানিকে যথা সম্ভব গোপন করতে তিনি ব্যস্ত। মন্দিরার সঙ্গে কোথাও কোনো সাদৃশ্য নেই। এককালে তিনি হয়তো অনিলার মতোই সুন্দরী ছিলেন, এখন সে-রূপের আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই; কেবল তুলি দিয়ে আঁকা

দুখানি বাঁকা ভুরুর নিচে, অতিশয় উজ্জ্বল দুখানি কোটরগত চোখ যেন চঞ্চল বিস্ময়ে চেয়ে থাকে—সে চোখ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না যে সত্যি-সত্যিই জীবনের তিন ভাগ কেটে গেছে।

ব্রজসুন্দর নমস্কার করে তাঁর পাশে আসন গ্রহণ করল। মন্দিরা ভাই-বোনদের নিয়ে শঙ্করের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে, এই এল বলে। অনিলার গানের ওস্তাদ কাজ সেরে জলযোগে ব্যাপৃত। অনিলা ব্রজসুন্দরকে দেখে হাসি-খুশিতে ভরে উঠল।

শঙ্করের মা, হেমনলিনী দেবী, মিস লাহিড়ী সকলেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু একবার প্রতি-নমস্কার করা ছাড়া তাঁরা কেউ ওদের কথাবার্তায় যোগ দেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না।

ব্রজসুন্দর অনিলাকে বললে, "তুমি সিনেমা দেখতে গেলে না যে বড়?"

অনিলা হেসে বললে, "নাঃ, দিদিকে একটা চান্স দিলাম। তাছাড়া আমার ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে যে একবার কোথাও গেছে সে আর সহজে দ্বিতীয়বার যেতে রাজী হয় না। আর তাছাড়া আপনি আমাকে যতটা অ্যাপ্রিসিয়েট করেন, শঙ্কর ততটা করে না। সে দিদির সাউন্ডার সদগুণগুলি বেশি পছন্দ করে।"

নির্মলা দেবী বাধা দিলেন, "কী যে বলিস অনিলা, ব্রজসুন্দরবাবু কী মনে করছেন বল্ তো?" ক্লান্ত পাখির কাকলির মতো কণ্ঠস্বর, হাত নাড়ার অসহায় ভঙ্গি। ব্রজসুন্দরের মন দ্বিগুণ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

"আজ গান শোনাবে না অনিলা?"

মাসিমা টেবিলের ওধার থেকে গম্ভীর স্বরে উত্তর দেন, "আজ অনিলা অনেকক্ষণ গলা সেধেছে ব্রজসুন্দরবাবু, এখন আর গান করা অসম্ভব।"

অনিলা টাট্টু ঘোড়ার মতো মাথা ঝাঁকিয়ে লাফিয়ে উঠে বলে,

"মোটেই অসম্ভব নয়। গলা সাধলে আমার গলা বরং আরও খুলে যায়। এই গানটা শুনবেন?" বলে গুণ-গুণ করে গান ধরে—

"ভ্রমর যেথা হয় বিবাগী নিভৃত নীল পদ্ম লাগি..."

ব্রজসুন্দর হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। কোমল কণ্ঠে অনিলাকে বলে, "আরেক দিন হবে, কেমন?" ঘরের সকলকে ছোট একটি নমস্কার করে বিদায় গ্রহণ করে। এবং ঘরের সকলেই প্রতি-নমস্কার করা ছাড়া আর কিছু বলেন না।

দরজার সামনে সিনেমা ফেরতদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। শঙ্কর দৃঢ়মুষ্টিতে ব্রজসুন্দরের কনুই ধরে বলে, "সে হয় না, মিষ্টার মুখার্জি।"

মন্দিরাও বলে, "সে হয় না, ব্রজসুন্দরবাবু।"

খোকন, সোনা, মণি তিনজনেই সমস্বরে বলে, "না, না, এখন বাড়ি যাওয়া হয় না। আমরা এত-এত চকোলেট কিনে এনেছি।"

শঙ্করের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে কোন কিছু এড়িয়ে যায় না। হঠাৎ সে বলে বসে, "আমরা দল বেঁধে আপনাদের বাড়ি যাব কবে মিষ্টার মুখার্জি? বেশ মজা পেয়েছেন তো! এখানে এসে চা খেয়ে যাবেন, আর নিজের বাড়িতে কাউকে ডাকবেন না, ও সব চলবে না। কবে যাব বলুন?"

ব্রজসুন্দরের মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মন্দিরা মনে-মনে শঙ্করকে ধন্যবাদ জানায়।

"নিশ্চয় যাবেন। কিন্তু দুদিন যাক, আমাদের বাড়িতে নন্দিনী বলে একটি ছোট মেয়ে আছে, তার আবার জ্বর হয়েছে। আজ আসি, তাই বলে যেন আমার ভাগের চকোলেট খেয়ে ফেলা না হয়।"

বাড়ি যাবার পথে ব্রজসুন্দর শতবার নিজেকে প্রশ্ন করেছিল কেন আসি—ক্ষুব্ধ অন্তর কোনো উত্তর দিতে পারেনি।

শঙ্কর সোজা উপরে চলে গেল, মন্দিরা নীরবে গৃহে প্রবেশ করল। ছোটদের খাওয়া-দাওয়া দেখাশোনা করা, মন্দিরার ঘরে ঢালা বিছানা

পাতা, মাসিমার ঘরে তাদের দুই বোনের ব্যবস্থা করা, এই সবেতে সন্ধ্যেটা কেটে গেল।

অনিলা মাসিমার সঙ্গে তর্ক করে, রাগ করে শয্যা নিল। মন্দিরা ধীর পদক্ষেপে বসবার ঘরে গিয়ে বসল। শঙ্করের মা ও মিস লাহিড়ী ততক্ষণে বিদায় নিয়েছেন। মাসিমারা দুই বোনে গম্ভীর মুখে মন্দিরার আগমনের প্রতীক্ষা করে আছেন।

মাসিমা লম্বা চেয়ারে পা মেলে দিয়েছেন, "কোথাও শান্তি নেই রে নির্মলা। তোর সংসারের কথা আর কী বলবি আমাকে? তোর স্বামীটিকে তো আমি আজ ত্রিশ বছর ধরে জানি। তখন তো কারো কথা শুনলি না। কিন্তু এখানেও শান্তি কোথায়? বাবা বলতেন সব জিনিসের সঙ্গে বোঝা-পড়া চলে, শুধু বিবেকের সঙ্গে চলে না। যা অন্যায় তা চিরকালই অন্যায়। অন্যায়ের স্থান কাল পাত্র ভেদ নেই—যে মন্দ সে মন্দই। সে রূপবান, শিক্ষিত, বা বড় বংশের, বা বন্ধুজন হলেও সে মন্দই, কাজেই তার সঙ্গে কখনো বোঝাপড়া করা যায় না।"

মন্দিরাও কেমন ক্লান্তি বোধ করছিল। সে কোনো মন্তব্যই প্রকাশ করল না।

"চুপ করে থাকলে চলবে না, মন্দিরা! তোমার তল পাওয়া দায়। কোনটা যে তোমার কর্তব্যজ্ঞান আর কোনটা যে তোমার মনের কথা বুঝে উঠি না। তুমিই বল, সবই তো জানো, ব্রজসুন্দরের সঙ্গে তোমাদের মেলা-মেশা করা কি উচিত?"

মন্দিরা হাতের সেলাইয়ের উপর মুখ নিচু করে বললে, "ব্রজসুন্দর-বাবুকে কিন্তু মন্দ বলে বিশ্বাস করা শক্ত, মাসিমা।"

"তবে কি মণিকা মিথ্যে কথা বলছে? মণিকার সঙ্গে আমার সব সময়ে মত না মিললেও তাকে আমি কখনো মিথ্যে কথা বলতে শুনিনি।"

"তাঁর তো ভুলও হতে পারে, মাসিমা।"

"ভুলও থাকতে পারে? একদিন নয়, দুদিন নয়, বারবার সে দেখেছে

বেশি রাত্রে ব্রজসুন্দরের ওখান থেকে মেয়েটিকে যাতায়াত করতে। আর তুমি নিজেই কি সত্যি মনে কর যে মণিকা ভুল দেখেছে?"

নির্মলা ব্যস্ত হয়ে বলেন, "শঙ্করেরও কিন্তু তাই মত, সেও বলে ব্রজসুন্দর খুব ভালো লোক।"

মাসিমা অসহিষ্ণুভাবে ভগ্নীকে বলেন, "তোমারও বোধহয় সেই মত। বেশ তো দুই মেয়ের সঙ্গে দুটি পাত্রের বিয়ে দিয়ে দাও না, সবাই নিশ্চিন্ত হোক।"

নির্মলা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমার আসাই ভুল হয়েছে, দিদি। অনিলারও এখানে এসে তোমার ঘাড়ে পড়া অন্যায় হয়েছে, আমরা গরিব মানুষ গরিবের মতো—"

তীক্ষ্মস্বরে মন্দিরা বলে, "ওসব কেন বলছ মা? এমন কিছু গরিব নও তুমি যে, আত্মসম্মানও তোমার থাকতে নেই। কী এমন হয়েছে যার জন্য বাড়িসুদ্ধ এমন একটা আন্দোলন চলবে? কেন অযোগ্য জিনিসকে বাড়তে দিয়ে নিজের মনের শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছ?"

মাসিমা উঠে দাঁড়ান, "তোমার মা কিছু বলেনি, মন্দিরা। যা বলবার আমিই বলেছি। আমি এখন শুতে যাচ্ছি, আমার খিদে নেই। তোমরাও আর রাত করো না।"

দরজার কাছ থেকে আবার বলেন, "মন্দিরা, তোমরা বড় হয়েছ, লেখা পড়া শিখেছ, ইচ্ছে মতো বন্ধুবান্ধব করবে, কিন্তু ব্রজসুন্দর যেন এ বাড়িতে পদার্পণ না করে। আমি সেকেলে মানুষ, আমার কতগুলো মানসিক শুচিবাই আছে।"

মন্দিরা শুধু দৃষ্টি তুলে চেয়ে থাকে। মাসিমা চলে গেলে প্রফুল্ল কণ্ঠে মাকে বলে, "এরা সবাই তো রেগে-মেগে উপোস করে রইল। আমার এদিকে বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে। চল দুজনে সকলের ভাগ খেয়ে ফেলি।"

কোনো কথা বলবার সুযোগ দেয় না মাকে। কর্মক্লিষ্ট কর্কশ হাত দুখানি ধরে তাঁকে টেনে খাবার জায়গায় নিয়ে যায়। জোর করে প্লেটে

খাবার তুলে দেয়। আপিসের বিষয় কত না মজার গল্প বলে, মা হাসতে বাধ্য হন।

খাবার পর শোবার পালা। নির্মলা দিদির ঘরে যেতে ভয় পান। মন্দিরা সেখানে তাঁর বিছানা পেতে রেখেছে, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে আসে।

আরেকটি দিন শেষ হয়। ব্রজসুন্দর বাড়ি ফিরে নিজের একতালার ঘরের দরজার কাছে পৌঁছতেই ত্রস্তপদে আয়া নেমে আসে। নন্দিনীর জ্বর যেন বেড়েছে, ব্রজসুন্দরকে একবার উপরে যেতে হয়।

ছোট মুখখানিকে কেমন অস্বাভাবিক রকম রাঙা মনে হয়। চোখ দুটি বন্ধ। ব্রজসুন্দর শঙ্কিত হয়ে পড়ে, টেলিফোন করে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসে। ডাক্তার আসতে দেরি হয়, অস্থিরভাবে সিঁড়ির নিচে পায়চারি করে। মন্দিরাদের বাড়ি থেকে যে মনের বোঝা নিয়ে ফিরেছিল সেসব কোথায় মিলিয়ে যায়, নতুন একটা নিদারুণ আশঙ্কা তার স্থান অধিকার করে। ছোট মেয়ের কঠিন অসুখ হলে কী যে করতে হয় ব্রজসুন্দর জানে না।

ডাক্তারবাবু এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "টিকে দেওয়া হয়েছিল?"

টিকে? তাই তো, টিকে দেওয়া হয়েছিল কিনা ব্রজসুন্দর কেমন করে বলবে?

ডাক্তারবাবু অসন্তুষ্ট হন। যারা সংসারী নয় তাদের ছেলেপুলের দায়িত্ব নেওয়া একটা ঝকমারি। গম্ভীর মুখে নার্সের ব্যবস্থা করেন।

রাত দশটার সময় ব্রজসুন্দরের সেই পরিচিত আধাবয়সী কালো নার্সটি এসে উপস্থিত হয়।

তার শামলা মুখখানি দেখবামাত্র ব্রজসুন্দর সাহস লাভ করে বললে, "বাঁচালেন আমাকে! দেখুন তো কী বিপদে পড়া গেল।"

নার্স হাসিমুখে চার্জ বুঝে নেয়। "যান, আপনি খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ুন তো। মেয়ের ভাবনা এখন আমি ভাবব; শুধু ওষুধপত্রের কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে যান। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না, আমি খেয়ে এসেছি।"

এতক্ষণ পরে ব্রজসুন্দর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে নিচে গিয়ে জামা-জুতো ছেড়ে, সুরেনকে ডেকে আহারাদি সমাধা করে। আলো নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবে—মেয়েদের নইলে চলে না। আমার মতো একজন নির্লিপ্ত ও সংসারবিহীন পুরুষমানুষেরও চলে না। কী আশ্চর্য, এই ছত্রিশ বছর বয়েস অবধি মেয়েদের কাছ থেকে কেবল সেবা নিয়েই এসেছি, অথচ কথাটা কখনো তলিয়ে দেখিনি। ভাবে, দিদিকে ভালো করে একখানা চিঠি লিখি। মণিমালার যদি আপত্তি না থাকে তবে বিয়েটা—নাঃ, আমার শরীর ক্লান্ত বলে এখন ওরকম মনে হচ্ছে।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনার একটা উপযুক্ত পরিস্থিতি থাকা উচিত। স্থান, কাল ও পাত্রের এমন একটা সমাবেশ হওয়া উচিত যাতে কোথাও কোনো খুঁত না থাকে। ঝপ করে যখন-তখন একটি ঘটে গেলে তার যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রোদ পড়ে এসেছে; এখনই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, গ্রীষ্মকালের আকস্মিক বৃষ্টি, অকারণ ও অপরিমিত। মন্দিরার বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছটির রাঙা ফুলের গা বেয়ে অনবরত জল ঝরে পড়ছে, লাল পাপড়ি টুপ টুপ করে খসে পড়ছে।

মন্দিরা একলা এসে গাছতলায় দাঁড়াল। কেমন একটা গভীর শান্তিতে তার মন ভরে উঠল, সেই শান্তি তার ক্লান্ত দেহের শিরায়-শিরায় প্রবাহিত হল। বহুদিন পরে মন্দিরা একলা বাগানে এসেছে। সত্যি কথা বলতে কি, বহুদিন পরে মন্দিরা দুদণ্ড একা থাকবার সুযোগ পেয়েছে।

কৃষ্ণচূড়া গাছের আলম্বিত ছায়াখানি ম্লান হয়ে আসে। নীরব পদক্ষেপে শঙ্কর এসে মন্দিরার পাশে দাঁড়ায়।

"মন্দিরা!"

চকিত হয়ে মন্দিরা শঙ্করের দিকে চেয়ে থাকে।

এক মুহূর্তকাল শঙ্কর নীরবে মন্দিরার গভীর দৃষ্টিতে তার বিষণ্ণ গভীর দৃষ্টি স্থাপন করে। বলে, "যা শেষ হয়ে গেছে, মন্দিরা, তাকে ফিরিয়ে আনা কত যে অসম্ভব তা বুঝেছি। আমি নিজের দোষে যা হারিয়েছি, সে আর ফিরে পাবার আমার সাধ্য নেই।"

মন্দিরা নিরুত্তর থাকে।

শঙ্কর আবার শুধোয়, "একান্তই কি অসম্ভব, মন্দিরা?"

ম্লান হেসে মন্দিরা বলে, "একান্তই অসম্ভব। তুমি চিরদিন আমার প্রিয়। তুমিই প্রথম আমার চোখ ফুটিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলে যে এ পৃথিবীটা কত সুন্দর। তোমার কাছে আমার ঋণ পরিশোধ করার নয়।"

"এইটুকু মাত্র? তার বেশি কিছু দিইনি?"

মন্দিরা বলে, "কী দিয়েছিলে, শঙ্কর? কত না রঙিন আশার কথা বলে আমার চোখে ঘোর লাগিয়ে দিয়েছিলে। যেদিন আমাকে প্রত্যাখ্যান করে চিঠি লিখেছিলে—সে চিঠি যে কত নিষ্ঠুর তুমি নিজে বোঝনি—মনে হয়েছিল আমার বুক ভেঙে গিয়েছে, আমার দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, আমার জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জীবন অত সহজে শেষ হয় না, শঙ্কর। পাঁচ বছর না যেতেই আমার হৃদয় জোড়া লেগে গেল, দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল—"

বাধা দিয়ে শঙ্কর বলে, "দৃষ্টি তোমার এখনো স্বাভাবিক হয়নি, মন্দিরা। ঘোর কেটে গেছে বটে, কিন্তু তাই বলে তাকে স্বাভাবিক হওয়া বলে না।"

তারপর কাছে এসে গভীর গলায় বলে, "আমি তোমার যোগ্যও নই, মন্দিরা। একদিন তোমার ভালোবাসা পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু তারপর তুমি আমার নাগালের বাইরে বহুদূরে চলে গিয়েছ, আমার স্পর্ধা কী যে তোমাকে লাভ করতে চাইব। সত্যিই আমি তোমার যোগ্য নই, মন্দিরা। কিন্তু তাই বলে তুমিও নিখুঁত একটি দেবীমূর্তি নও। তুমিও একজন নারী, যতই না অসাধারণ হও। তোমার এত বুদ্ধি, চোখ বুজে থাক কেন? সংসারের দিকে চোখ খুলে তাকাবার সাহস নেই তোমার।"

মন্দিরা প্রতিবাদ করে না। শঙ্করের হাত দুখানি ধরে বলে, "তুমি আমার কত প্রিয় তুমি জানো না, শঙ্কর। আর তুমি যদি অনিলাকে বিয়ে কর তবে বেশ হয়।"

অবাক হয়ে যায় শঙ্কর। অনিলাকে বিয়ে করবে? অনিলা রাজী হবে কেন? শঙ্কর যে আধ-বুড়ো হতে চলল।

"তুমি একবার বলেই দেখ না, শঙ্কর। সে তোমাকে খুব সুখী করতে পারবে। সে যে কত স্নেহশীলা তুমি জানো না।"

"খুব জানি। সে যতটা স্নেহশীলা ততটা গোপনশীল তো নয়। আর তুমি? আমি অনিলাকে বিয়ে করব, তুমি কী করবে?"

"আমার জন্য তোমার আর ভাবতে হবে না, শঙ্কর। আমি আধখানা একটা আপিস চালাই, তা জানো? আর তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। যা সত্যি, চোখ খুলে তার দিকে চাইবার সাহস আমার নেই, একথা তোমাকে কে বললে?"

এসব কথা গোপন থাকে না। কতক-কতক শঙ্কর নিজে তার মা'র কাছে প্রকাশ করে। কতক মন্দিরা অনিলাকে বলে। অনিলা কোনো উত্তর না দিয়ে হাত বাড়িয়ে পাশ থেকে বিছানাঢাকাটা টেনে নিয়ে এই ঘোর গরমেও নাক মুখ ঢেকে শুয়ে রইল।

শঙ্করের মা মুখর হয়ে উঠলেন, "আমি আর কোনো আপত্তিই করব না, শঙ্কর। মেয়েটি সুশ্রী, ব্যবহার ভালো, তোমার সঙ্গে মোটেই বেমানান হবে না। যে সব কারণে মন্দিরার বেলায় আপত্তি করেছিলাম, আজকাল আর সে সবের চল নেই। ফ্যামিলির জন্যে আর কেউ কেয়ার করে না, পাত্রের টাকা আর পাত্রীর রূপ থাকলেই হল। এক্ষেত্রে দুই-ই আছে, কাজেই আমার আর আপত্তি করা সাজে না। তাছাড়া তুমি নিজেই যখন বিয়ের কথা বলছ, বারবার তোমাকে হতাশ করাও আমার কর্তব্য নয়। সেবারও কিছু আমার নিজের সুখের জন্য আপত্তি করিনি, যা কর্তব্য মনে হয়েছিল তাই বলেছিলাম। বেশ তো, অনিলা আমাদের বউ হলে তো আনন্দের কথাই হবে। হেমনলিনী আর নির্মলার সঙ্গে আমাদের

বাবা-মা'র আমল থেকে বন্ধুত্ব, এত খুবই সুখের কথা। নির্মলাকে কিছু বলেছ?"

মাকে ছাড়া শঙ্কর কাউকে কিছু বলেনি শুনে মা আহ্লাদে গলে যান। "নির্মলার কোনো আপত্তি হবে না। একটি মেয়ের ভালো বিয়ে হচ্ছে, কেনই বা আপত্তি করবে। তুমি দেখো, শঙ্কর, দিল্লীতে অনিলা খুব সাক্সেসফুল হবে, কি গলা ওর, লোকে শুনে মুগ্ধ হয়ে যাবে। আমার মুক্তোর সাতনরী দিয়ে ওকে আশীর্বাদ করব। হীরের সেট দিয়ে বউ ঘরে তুলব। আমি তো তোমার মতিগতি দেখে তোমার বিয়ের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম, তবে এবার তোমার বিয়ে না দিয়ে দিল্লী ফিরব না পণ করে এসেছিলাম, যাক ভগবান আমার মুখ রেখেছেন।"

নির্মলাদেবীর কোনো আপত্তি থাকবার কারণ ছিল না। "তোরা সুখী হলেই আমি সুখী হই। মন্দিরার বিয়ের বয়েস তো একরকম চলেই গেছে, এখন তুই বিয়ে করে সুখী হ, এই আমার প্রার্থনা। কিছুই করতে পারিনি তোদের জন্য, কিছুই দিতে পারিনি কোনো দিন, এখন ভগবান তোদের সব দেবেন।"

মন্দিরা হেসে বলে, "তা না হয় দিলেন। কিন্তু মন্দিরার বিয়ের বয়স চলে গেছে শুনে যে বড়ই মুষড়ে পড়লাম!"

খোকন, সোনা, মণি সুর করে বলে, "এ মা! দিদির বিয়ের বয়েস চলে গেছে। ছি! ছি!"

মণিকা-মাসিমা একগোছা লাল গোলাপ ফুল নিয়ে এসে অভিনন্দন করেন। "খুব খুশি, অনিলা। মন্দিরা কোনো কর্মের নয়। সাধারণ মেয়েদের পক্ষে এই তো স্বাভাবিক জীবন। আমাদের মতো কর্মীর জীবন কি সোজা কথা? অনেকখানি স্বার্থত্যাগ, অনেকখানি কর্মনিষ্ঠা না থাকলে পারা যায় না। খুব ভালো হল। অবিবাহিত থাকা কি সোজা নাকি? ভালো থাকা বড় শক্ত, অনিলা। আমার পাশের বাড়িতে চেয়ে দেখলে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে। নয়নতারা আনয়েডুকেটেড হলেও তখন

সংসারের একটা ছিরি-ছাঁদ ছিল। সে চলে গিয়ে অবধি সব যা-তা হয়ে গেছে। ব্রজসুন্দর তো গোল্লায় যেতে বসেছে। সেই সুন্দরী মেয়েটি তো আজকাল ওখানেই একরকম বসবাস করে। আবার শুনি খুকিটির খুব অসুখ, নার্সটার্সও দেখেছি।"

অনিলা তীক্ষ্নকণ্ঠে বলে, "অসুখ? কী অসুখ মণিকা-মাসিমা?"

"কে জানে বাবা, কী অসুখ! ও বাড়িতে কি আর ভদ্রলোকের মেয়ের পদার্পণ করবার যো আছে?"

অনিলা বলে, "বেশ, আমি শঙ্করকে বলব, খোঁজ নিতে। দিদি, তুমি বললে না—গোলাপীই ভালো হবে না ঘি রঙ নেব?"

মাসিমাই অনিলার সব কাপড়-জামা গহনা-গাঁটি দেবেন। নইলে নির্মলা পারবে কেন? নিজের জীবনটা তো একেবারে মাটি করেছে, এখন মেয়ের জীবনটা অন্তত উপযুক্তভাবে শুরু হোক।

মন্দিরার নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। ভাবে এমনি করে বিয়ে হয়—কাপড়, গহনা, দান-সামগ্রীর ফর্দ করতে হয়। আশীর্বাদের আভরণ যাতে অপর পক্ষের উপযুক্ত হয় সে বিষয় দৃষ্টি রাখতে হয়। নিমন্ত্রিতদের ফর্দ করতে হয়। কোনো ব্যবস্থার খুঁত রাখতে হয় না, নিমন্ত্রণপত্রটি পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে রচনা করতে হয়। তারপর উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর বিয়ে হয়ে যায়, তারা সুখে ঘরকন্না করে।

মন্দিরার মনের মধ্যে অহর্নিশি ছোট একটি পাখি যেন অক্লান্তভাবে ডানা ঝাপটায়। সুখ? সুখ কাকে বলে? কে সুখী হয়? কেন সুখী হয়? সুখী হলে কী হয়? মানুষ মরে গেলে সুখের কতটুকু অবশিষ্ট রয়ে যায়? মেসোমশাই আর মাসিমাও হয়তো একদিন সুখী ছিলেন; এখন আর তার কী বাকি আছে? গোলাপগাছটি পর্যন্ত শঙ্করের আত্মীয়রা কেটে ফেলেছে।

অনিলা সুখী হোক। অনিলা সুখী না হলে মন্দিরার বুক ফেটে যাবে। তাও কি হয়? একজনের জন্য আরেকজনের আবার বুক ফাটে

নাকি? ওদের সুখী কর ভগবান। সুখী হলে কী হয়? কদিনের জন্য মানুষ সুখী হয়? মরে গেলেই তো সুখের অবসান।

কিন্তু পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায় রোদ এসে লাগে—মন্দিরার মন আবার শান্ত হয়ে যায়।

নির্মলা দেবী কিছুই বোঝেন না। বলেন, "সবাই যখন কলকাতায়, এখানে বিয়ে হলেই তো ভালো।"

মাসিমা বিরক্ত হয়ে ওঠেন, "আমার সুবিধের জন্য বলছি না, নির্মলা। তোমরা ছাড়া আমার আর কে-ই বা আছে? কিন্তু তোমার একটা ডিগনিটির আইডিয়া নেই। পাটনায় তোমার স্বামীর নিজের বাড়িতে ছাড়া আর কোথাও বিয়ে হতে পারে না। এখানে কী করে হবে? শঙ্কর থাকবে উপরে, তোমরা থাকবে নিচে, সে কি সিঁড়ি বেয়ে নিচে আসবে বিয়ে করতে? একটা শোভনীয়তাও তো আছে?"

কথা শুনে অনিলা হেসে কুটোপাটি হয়। ঠিক হয় পাটনায় বিয়ে হবে, একমাস পরেই। আশীর্বাদ এখনই হয়ে যাবে।

"দিদি, তোকে যদি ছুটি না দেয়?"

"আরে আমাকে ছুটি না দিলেও কি আর তোর খেয়াল থাকবে?"

"আমি চলে গেলে তোর কষ্ট হবে?"

"তা একটু হবে হয়তো।"

অনিলা হঠাৎ কেঁদে ফেলে। "দিদি তোরই তো আগে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। তোরই তো শঙ্করের সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল।"

"যা, যা, শঙ্করটা কোনো দিক দিয়ে আমার উপযুক্ত নয়। তোর মতো একটা আহাম্মক ছাড়া আর কারো সঙ্গে ওকে মানায় না।"

অনিলা খুশি হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। একবার বলে, "ব্রজসুন্দরবাবুকে কিন্তু নেমন্তন্ন করতে হবে। ভদ্রলোকের কী হল একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। দেখি, শঙ্করের যদি সময় হয়।"

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মন্দিরাদের আপিসে কে যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কার যেন বহুদিনের ছুটি পাওনা হয়ে গিয়েছে, কে যেন মারাও গেছে শোনা গেল। শেষ পর্যন্ত মন্দিরা তাই বোনের বিবাহ উপলক্ষে ছুটি প্রার্থনা করতেই পারল না। অনিলার তাই শুনে ভারি অভিমান হল, শঙ্কর দুঃখিত হল, মা-মাসিমা বারবার বললেন, "তুমি না গেলে, লোকে কিন্তু অন্যরকম কারণ ঠাওরাবে, মন্দিরা।" মন্দিরা আশ্চর্য হয়ে মা-মাসির মুখের দিকে চেয়ে বললে, "লোকের কথার কী বা দাম?"

কিছুদিন ধরে কেনা-কাটার ধুম পড়ে গেল। মাসিমা সিন্দুকের চাবি মন্দিরার হাতে দিয়ে দিলেন, "যা-যা দরকার মনে করবে তাই কিনবে, মন্দিরা। অনিলার যা কিছু দরকার হবে সব কিনে দিও। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, কার্পণ্যও করবে না, অযথা খরচও করবে না, এ আমি বেশ জানি।"

মন্দিরা কৃতজ্ঞচিত্তে গুছিয়ে-গাছিয়ে বাজার করে আনে। অনিলাকে সঙ্গে নিয়ে যায়, রঙ পছন্দ করবে, প্যাটার্ন পছন্দ করবে সে। মাঝে-মাঝে তাই নিয়ে দুই বোনে একটু খিটিমিটিও লাগে।

নির্মলা দেবীর বিষম ভয়, দুনিয়ার সকল রোমাঞ্চকর ঘটনা বুঝি তাঁর অনুপস্থিতিতেই ঘটে গেল, তাই তিনি কোনো মতেই বাড়িতে থাকতে প্রস্তুত নন। "কী যে বলিস মন্দিরা, দিদির সঙ্গে আমার তুলনা? দিদি আমার চেয়ে অনেক বড়, আর তোরা কি আমাকে এমনই সেকেলে মনে করিস যে আমার আবার পছন্দ বলে একটা জিনিস থাকতে পারে তাও মানিস না?" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের কর্মক্লান্ত হাত দুখানির ভাঙা-ভাঙা নখগুলির দিকে চেয়ে, কাঁচায়-পাকায় মেশানো কোঁকড়া চুল-

গুলিকে অনিলার মতো ভঙ্গিতে নেড়ে বলেন, "জানিস, এককালে লোকে আমাকে বলতো—দি টোস্ট্ অফ দি টাউন!"

মন্দিরার মন বেদনায় ভরে ওঠে। মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, "তুমি পাছে ক্লান্ত হও, তাই বলছিলাম, মা। বেশ তো, তুমিও চল না, খুব ভালো হবে।"

অনিলা গাল ফুলিয়ে বলে, "বেশ, যাবে তো চল। কিন্তু তাই বলে আমরা যখন রিবন দিয়ে সিল্ক দিয়ে ইলাষ্টিক দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র কিনব তুমি ভিকটোরিয়ান ভাবে নাক সিঁটকোতে পারে না।" তাই নিয়ে তুমুল কলহের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত মন্দিরাকে শান্তি স্থাপন করতে হয়। বলে, "কেন ব্যস্ত হচ্ছ মা, জিনিস তো আর ও কিনবে না, কিনব আমি। যা-তা কিনতে আমি দেব কেন?"

তারপর একদিন কেনা-কাটা সারা হল। বিবাহের দিন স্থির হল। নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হল, বিয়েবাড়ি হল পাটনায়, নির্মলা দেবী জিনিসপত্র, কন্যা ও পাঁচ-সাতজন আত্মীয়-কুটুম্ব নিয়ে পাটনা চলে গেলেন। শেষ মুহূর্ত অবধি মাসিমাকে বহু অনুনয় বিনয় করা হল, অনিলা তাঁর গলা জড়িয়ে খানিকটা কেঁদে নিল পর্যন্ত, কিন্তু মাসিমা কোনো মতেই পাটনা যেতে রাজী হলেন না।

"আমি এখান থেকেই তোমাদের আশীর্বাদ করব, অনিলা। কিন্তু তুমি তো জানো তোমার মেসোমশাই-এর মৃত্যুর পর থেকে আমি কোথাও যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। চেঞ্জে পর্যন্ত আর যাই না, আমার শ্বশুরের তৈরি এই বাড়িই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

অগত্যা বিয়ের যাত্রীরা সত্যি-সত্যিই চলে গেলেন। সারা বাড়ি জুড়ে কেমন একটা অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। সেদিনও শনিবার, আপিস থেকে একটু সকাল-সকাল এসে মন্দিরা চায়ের আয়োজন করতে লাগল। তার মনে হল ঘর-জোড়া এ নীরবতায় কোনো শান্তি নেই, বরং বিষম অশান্তিকর কিছু আছে। জোর করে প্রফুল্ল

কণ্ঠে মাসিমাকে বললে, "মণিকা-মাসিমা আসবেন তো? তাঁর জন্যে আজ খনার মা মাছের কচুরি করছে।"

মাসিমা নীরস কণ্ঠে বললেন, "মাছের কচুরি করতে আমিই বলে দিয়েছি। তবে এখুনি ভাজতে বারণ কর, সে আসুক।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার অসন্তুষ্টভাবে বলেন, "সময়ের কোনো একটা জ্ঞান নেই মণিকার। আমরা ক'টার সময়ে চা খাই সে বেশ জানে, তবু দেরি করবে।"

মন্দিরা ভাবে এ জীবনটা মায়া, ছ'মাসের উপরে অতিবাহিত হল কিন্তু যেখানে ছিলাম ঠিক সেখানেই রয়ে গেলাম। ভাবে এ-ছ'মাস যদি নাই থাকত কি বা ক্ষতি হত? ভাবে সেকি! ক্ষতি হত না মানে? আমার বুকের ভিতরের পুরোনো ব্যথাটা চলে গেল সে কি কিছু নয়? অনিলার ভবিষ্যতের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল সেটাও কি কিছু নয়? মা এসে দুদিন বিশ্রাম করে গেলেন সে কি কিছু নয়? ব্রজসুন্দরের সঙ্গে পরিচয় হল সে কি কিছু নয়?

মণিকা-মাসিমা এসে উপস্থিত হন।

"বাস্তবিক মণিকা, দিন-দিন তোমার অবনতি হচ্ছে, স্কুলে তুমি সব চেয়ে পাঙ্চুয়েল ছিলে বলে আমরা কত না খোঁটা খেয়েছি। আর তুমিই আজকাল সময়ের কোনো ধার ধারো না।"

মণিকা-মাসিমা একখানি নিচু কেদারায় বসে পড়ে কিছুক্ষণ ধরে হাঁপ ছাড়েন। মাসিমা তাই দেখে আরও বলেন, "বড্ড মোটাও হয়ে যাচ্ছ, এ বয়েসে একটু সাবধানে থাকা ভালো, দেখো তো কি রকম হাঁপাচ্ছ। ব্লাড্ প্রেসারটা একবার নিলে পার।"

মণিকা-মাসিমা একহাতে বুক চেপে ধরে দম নিয়ে বলেন, "তুমি থামো তো হেমনলিনী, নিজে এক পা নড়ে বসবে না, আবার আমাকে পরামর্শ দিচ্ছ!"

মন্দিরা অবাক হয়ে তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হাসিমুখে, কোমল কণ্ঠে বলে, "এদিকে এসে বসুন মণিকা-মাসিমা,

এখানে বেশ খাসা হাওয়া আসছে। দেখুন কি সুন্দর কচুরি করেছে খনার মা, আর আমি আপনার পছন্দ মতো চীজকেক কিনে এনেছি। ও মাসিমা, উঠে একটু কাছে বস না। এত হট্টোগোলের পর বাড়িটা যে একেবারে ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে।"

দুই মাসিমাই কাছে এসে বসেন। মণিকা-মাসিমা বলেন, "সত্যি, খুব ভালো কচুরি, মন্দিরা! খনার মাকে তো খনা ট্রেনিং দিয়েছে। এবার দেখ কোনো বন্ধু-বান্ধব ওকে ভাগিয়ে নেবে।" ততক্ষণে খনার মাও আরেক খোলা গরম কচুরি নিয়ে হাজির হয়েছে।

মন্দিরা হেসে বললে, "খনার মাকে যদি কেউ ভাগিয়ে নিয়ে যায়, আমিও তৎক্ষণাৎ ন্যাপলাকে তাড়িয়ে দেব। দেখব তখন খনার মা কি করে!"

খনার মা স্মিত হেসে বলে, "না, না, আমি হেথা ছেড়ে কোথাও যাবনি।"

সে প্রস্থান করলে মাসিমা গম্ভীর কণ্ঠে মন্দিরাকে তিরস্কার করেন, "চাকর-বাকরের সঙ্গে রসিকতা আবার কি, মন্দিরা? ওরকম করলে দিন-দিন ওদের আস্পর্ধা বেড়ে যাবে।"

মন্দিরাও বহুদিন আগেকার বহু তর্কের রেশ টেনে বলে, "কদিন আর ওদের দমিয়ে রাখবে, মাসিমা? দেখ না, ওদেরও দিন হয়ে এল। তাই না, মণিকা-মাসিমা?"

মণিকা-মাসিমা আরাম করে বসে বললেন, "তা কিছু বলা যায় না, মন্দিরা। ঐ ব্রজসুন্দরের বাড়ি গিয়ে দেখলাম তার চাকররা কেমন বাধ্য। অবিশ্যি অদ্ভুত রকমের স্বাধীনতাও পায় তারা। তারাই বাজার করছে, দুধ নিচ্ছে, ভাঁড়ার দিচ্ছে, কী রান্না হবে না হবে ঠিক করছে, ধোপার কাপড় গুনে নিচ্ছে, টাকা পয়সারও খুব সম্ভব শ্রাদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু এই বিপদের সময়ে খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, মনিবের সঙ্গে-সঙ্গে রয়েছে তো!"

হেমনলিনী দেবীর কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে এল, "তুমি আবার ওদের বাড়ি যাওয়া-আসা করছ বুঝি? বলিহারি তোমাকে!"

মন্দিরা জিগগেস করল, "কী বিপদ, মণিকা-মাসিমা?"

"ঐ যে ছোট খুকিটি তার আবার নিউমোনিয়া হয়েছে, প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কাল রাত্রিবেলা একবার থাকতে না পেরে দেখতে গেলাম। হাজার হোক মানুষের প্রাণ তো। গিয়ে দেখলাম, ব্রজসুন্দর আর একজন পরমাসুন্দরী মেয়ে পাশাপাশি বসে রাত জাগছে, ডাক্তারে নার্সে হাঁটা-হাঁটি করছে আর ঐ যে বললাম, চাকর-বাকরগুলোর পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠেছে।"

ঘরের মধ্যে নীরবতা বিরাজ করে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে মণিকা-মাসিমা বললেন, "কিছু মনে কোরো না, মন্দিরা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শঙ্কর কেন তোমাকে বিয়ে না করে অনিলাকে করছে এটা বুঝলাম না।"

"কেন মাসিমা অনিলার সঙ্গেই তো মানাবে ভালো, দুই পক্ষই খুশি হবে।"

"আর তোমার বেলা যে-সব পুরোনো তর্কগুলো শুনেছিলাম, তোমাদের পরিবার ওদের উপযুক্ত নয় ইত্যাদি, সে-সব বুঝি অনিলার বেলায় খাটল না?"

মন্দিরা প্রসন্নভাবে বললে, "সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সব জিনিসেরই পরিবর্তন হয়, মতামতেরও। আমার সঙ্গে শঙ্করের এখন আর কোথাও মিল নেই। অনিলাকে বিয়ে করে দুজনে সুখী হোক—এই তো বেশ ভালো।"

মাসিমার মন অকারণে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। বলেন, "তোমার তল পাওয়া দায়, মন্দিরা। স্বাভাবিক মেয়েদের মতো কি তুমি হতে পার না? অমন পরমহংস সেজো না। আসলে তোমার মন অন্য জায়গায় আবদ্ধ হয়েছে বলে তুমি অমন উদারতা দেখাতে পারছ। আমি কি কিছুই বুঝি না ভেবেছ?"

ধীরে-ধীরে মন্দিরার কণ্ঠ থেকে চুলের গোড়া পর্যন্ত রক্তিম হয়ে ওঠে, নিঃশব্দে সে ঘর থেকে চলে যায়।

"ভুল করলে, হেমনলিনী, অমন করে খোঁচা দিলে হিতে বিপরীত হবে। তুমি ওকে ঠেলে আরও ব্রজসুন্দরের প্রতি এগিয়ে দিলে।"

রান্নাঘরে খনার মাকে মন্দিরা সাহায্য করে। তার নীরব কর্মপটুতায় খনার মা অবাক হয়ে যায়, সাহস করে কোনো প্রশ্ন করে না।

মন্দিরা ভাবে কোনো কিছুরই অর্থ হয় না। মাসিমার সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। শঙ্করের প্রতি আমার ভালোবাসা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সত্যিই তো, যেসব কারণের জন্য একদিন শঙ্করের মা আমার হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন সে সবও আজ অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে। আমার সে অতীত দুঃখেরও চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই।

রান্নাঘরের খোলা জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে পূর্ণিমার চাঁদ কৃষ্ণচূড়া-গাছের পিছন দিয়ে ধীরে-ধীরে উঠছে। কৃষ্ণচূড়ার পাতায়-পাতায় তার আলো পড়ছে, ম্যাগনোলিয়া গাছের বড়-বড় পাতার উপরের গাঢ় সবুজ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, আর পাতার তলার ঈষৎ লালচে রঙ ঘোর কালোতে পরিণত হচ্ছে। মনে হল এসবের তো কোনো পরিবর্তন হয়নি — সহস্র বছরেও কোনো পরিবর্তন হবে না। এই নির্বাক চন্দ্র-সূর্য, এই নিশ্চল ডালপালা এরা আমার চেয়েও সত্য। আমার রাগ ভালোবাসা সুখ দুঃখ কিছুই স্থায়ী নয়, আমার জীবনের কোনো মূল্যই নেই।

কত কথা ভাবল মন্দিরা, কেবল ব্রজসুন্দরের চিন্তাকে মনে স্থান দিল না। সে কারো প্রসাদ-প্রার্থিনী নয়।

ব্রজসুন্দর তখন একতলার খাবার ঘরে চা পানে রত। সুরেন মা-মুরগীর মতো তার চারপাশে ডানা ঝাপটে বেড়াচ্ছে। ধীরে-ধীরে সিঁড়ি

বেয়ে মৃগনয়না এক নারী নেমে এল, তার চোখের তারকার আড়ালে অশ্রুরাশি জমা হয়ে আছে। ব্রজসুন্দরের সামনে এসে সে শুধোলে, "বাঁচবে তো?"

ব্রজসুন্দর ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, "বাঃ, বাঁচবে না তো কি! ডাক্তার-বাবু বলেছেন বিপদ কেটে গেছে, তবে কেন আপনি এত উতলা হচ্ছেন। ভালো হয়ে গেলেই আমি ওকে ভালো জায়গায় চেঞ্জে নিয়ে যাব। সঙ্গে আপনিও যাবেন? রাত জেগে-জেগে আপনারও তো শরীর খারাপ হয়ে গেছে।"

মেয়েটি মাথা নেড়ে বললে, "না, ব্রজসুন্দরবাবু, আপনি ওকে চেঞ্জে নিয়ে যাবেন না, আমি নিয়ে যাব। ও যদি ভালো হয়ে ওঠে আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাব। আপনার মতো মানুষ যে হয় এ আমি জানতাম না। আমার বিষয়ে কি আপনার কোনো কৌতূহলই হয় না? কেন আমি নিজের মেয়ে অচেনা লোককে দিয়ে দিলাম। এও জানতে ইচ্ছা হয় না?" তার সুকোমল গাল দুটি বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

ব্রজসুন্দর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। "কী মুশকিল! খানিকটা কৌতূহল হয় বৈকি, সত্যি কথা বলতে কি একটু রাগও হয়, মা হয়ে কেউ মেয়ে বিলিয়ে দেয় এ আমি শুনিনি। কিন্তু নিশ্চয়ই আপনার কোনো কারণ আছে, আর তা শুনেই বা আমার কী হবে?"

মেয়েটি ধীরে-ধীরে ব্রজসুন্দরের সামনের চেয়ারটাতে বসে পড়ে। ব্রজসুন্দর আশ্চর্য হয়ে ভাবে এ যে অবিকল লিলি ফুলের মতো দেখতে। আজ চোখে মুখে কোন প্রসাধনের চিহ্ন নেই, কোঁকড়া চুল অযত্নে পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, দু-এক গুছি চূর্ণ কুন্তল ললাটের উপর ছায়া বিস্তার করছে। কোলের উপর আলগোছে ন্যস্ত হাত দুখানিও কি সুন্দর!

"তবে শুনুন।"

তার কথা শুনে ব্রজসুন্দর ব্যথিত হয়ে উঠে বলে, "কেন খামখা

নিজেকে এত কষ্ট দিচ্ছেন বলুন তো? বেশ তো, তখন প্রয়োজন হয়েছিল আমার কাছে মেয়ে দিয়েছিলেন। আবার এখন অন্য রকম মনে হচ্ছে নিজের কাছে মেয়ে রাখবেন, এই তো ফুরিয়ে গেল। এখন উঠুন, হাতে-মুখে জল দিন, কিছু খান। উঠুন তো দেখি।"

দরজার কাছে পায়ের শব্দ হয়, ব্রজসুন্দর চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখে মন্দিরা। ব্রজসুন্দরের সঙ্গিনী ত্রস্তপদে উঠে দাঁড়ায়। মন্দিরা নীরবে তাদের অভিবাদন করে কাছে আসে।

"নন্দিনী কেমন আছে?"

"একটু ভালোর দিকে এখন। আপনি এত রাত্রে একা এলেন?"

"আমার কোনো সঙ্গীর প্রয়োজন হয় না।"

"বসুন, সুরেনকে বলি আপনাকে চা এনে দিক।"

"না, থাক এমনি খবর নিতে এলাম, যাই আমি।"

কোথায় যেন একটা বাধা। সুন্দরী মেয়েটি একান্ত নির্বোধ নয়, দু-এক পা এগিয়ে আসে।

"আমি নন্দিনীর মা, আমার নাম সাবিত্রী।"

"ওঃ, আপনি নন্দিনীর মা?" ছোট একটি নমস্কার করে মন্দিরা বলে, "আজ আসি।"

ব্রজসুন্দরের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। এতদিনে তার দৃষ্টি খোলে। ছায়াচ্ছন্ন পথ ধরে মন্দিরার সঙ্গে সে ফটক অবধি আসে।

"মন্দিরা ভুল বুঝো না। ঐ মেয়েটি সত্যিই নন্দিনীর মা, ভালো গাইয়ে। ও অনেক দুঃখ পেয়েছে। কোন একজন লোক ওকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু পাছে মেয়ের কথা জানলে সে পিছিয়ে পড়ে তাই মেয়েকে দিয়ে দিয়েছিল।"

"রাস্তায়? অপরিচিত লোককে?"

"শোনো মন্দিরা, কখনো সত্যি দুঃখ পাওনি তাই বুঝছ না।"

মন্দিরা ঈষৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "আমি তো কিছুই বলিনি।"

ব্রজসুন্দর যেন একটা তুষারের দেয়ালকে স্পর্শ করে। তবু বলে, "অন্তত আপনাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না। আপনি তো জানেন আমি একাই যাওয়া-আসা করে থাকি।"

ব্রজসুন্দর নমস্কার করে মন্দিরাকে বিদায় দেয়।

ঘরে পা দিতেই সাবিত্রী ছুটে আসে, জিগগেস করে, "বললেন না ওকে সব কথা?"

"বলেছি। চলুন, কিছু খাবেন।"

"তবু চলে গেল?"

ব্রজসুন্দর বললে, "হ্যাঁ, তবু চলে গেল। জানেন, মেয়েরা দুর্বলতাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না।"

"আমার জন্য আজ আপনি অপদস্থ হলেন।"

ব্রজসুন্দর বললে, "আপনিও আমার অতিথি, সেও আমার অতিথি। আপনি আছেন বলে সে যদি চলে যায় তবে আর কী করা যায় বলুন— চলুন ও ঘরে।"

সাবিত্রী দুঃখিত স্বরে বললে, "আপনিও অমনি মেনে নিলেন? কি রকম পুরুষমানুষ আপনি? দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারলেন না তাকে? এতবড় আস্পর্ধা যে আপনাকে সন্দেহ করে?"

ব্রজসুন্দর নিরুত্তর। সুরেন চা এনে দেয়। সাবিত্রী আর মন্দিরার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে সাহস পায় না। আপাতদৃষ্টিতে ব্রজসুন্দরের মুখের দিকে চেয়ে ভাবে ব্রজসুন্দরবাবু ঐ গম্ভীর মেয়েটিকে ভালোবাসে। বলিহারি ভাই পুরুষমানুষদের পছন্দ!

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১৩ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মন্দিরা তার ঘরদোর গুছোতে বসেছে, তার মন ভালো নেই। মাসিমা হঠাৎ কেমন যেন বুড়ো হয়ে গেছেন, তাঁর ভাষার যে তীক্ষ্ণতা এত বছর ধরে ক্রমাগত সবাইকে ক্লিষ্ট করেছে তা যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

বহুদিনের জমানো রাশি-রাশি কাপড়-চোপড় কাগজ-পত্রে বিছানা আসবাব ছেয়ে গেল। অবাক হয়ে মন্দিরা ভাবে বছরে-বছরে কত না রাবিশ জমিয়ে জীবনটাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছি, বুকের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখবার মতো কিছু রাখিনি। জানলা দিয়ে উদাস নয়নে আকাশ-পানে চেয়ে ভাবে এই পৃথিবীতে জন্ম নেবার কি কোনো সার্থকতা আছে? এত বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি এই বুঝি বিশেষ অর্থপূর্ণ একটা কিছু ঘটবে যার জন্য আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। এখন ভয় হয় বুঝি আমার জন্মগ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ভাবে, এ দুনিয়ার লক্ষ কোটি নরনারীর জন্মানোরই বা কী প্রয়োজন ছিল? দু'হাজার বছর আগেও যেমন দুঃখ বেদনা ব্যর্থতা ছিল, এখনও তাই আছে। মহাপুরুষরাও বৃথাই দুঃখ বরণ করে গেছেন, দুনিয়ার কোনো পরিবর্তনই হয়নি।

চেয়ে-চেয়ে দেখে গোছা-গোছা কত চিঠি, একদিন নিশ্চয় মনে হয়েছিল এগুলির কোনো মূল্য আছে; নইলে কেনই বা তাদের নীল রেশমী ফিতে দিয়ে বেঁধে গোলাপ ফুলের ছবি আঁকা সাবানের বাক্সে যত্ন করে ভরে রেখেছিল। টান দিয়ে মন্দিরা চিঠিগুলিকে ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

কাপড়-চোপড়গুলিকে দেখে, কত না বাহারের জিনিস। কেন কিনেছিল? ছোটবেলায় বিশেষ কোনো শখ মেটাবার সুযোগ পায়নি, প্রয়োজনের চাহিদা মেটানোই তাদের বাড়িতে দায় ছিল। তাতে কোনো দুঃখ ছিল না কারণ তরুণী মন্দিরার মনে তখন কোনো সংশয় ছিল না যে একদিন আর্থিক ও পরমার্থিক সমস্ত সাধ তার পূর্ণ হবে। পরে যখন প্রথম চাকরিতে প্রবেশ করেছিল মনের শখ মিটিয়ে জিনিসপত্র কিনেছিল, কত না জামা জুতো হ্যান্ডব্যাগ রুমাল। তাই দিয়ে মন্দিরার ঘর আজ বোঝাই হয়ে রয়েছে। সত্যিকার তুলে রাখবার মতো জিনিস কিছুই সে পায়নি।

দরজায় কার ছায়া পড়ে। মন্দিরা চোখ তুলে চেয়ে দেখে মাসিমা। "এস, মাসিমা, এখানে বস।"

হেমনলিনী দেবী ক্লান্ত দৃষ্টিতে ঘরের অব্যবস্থার দিকে চেয়ে বলেন, "গোছাতে বসেছ? আমিও আগে-আগে বাড়ি ওলট-পালট করে গুছোতে বসতাম। তারপর তোমার মেসোমশাই যাওয়ার পর দেখতাম জিনিস গোছাব কি, জিনিস তো নয়, এক-একখানি বিরাট ইতিহাস। আর গুছোতাম না, মন্দিরা।"

তারপর ঘরের চারদিকে চেয়ে বলেন, "এই ঘরখানাকে ছেলেমেয়েদের ঘর করব মনে করেছিলাম, দিনের বেলায় তারা এ ঘরে খাবে-দাবে, খেলা করবে, আর রাত্রে উপরে শুতে যাবে। তোমার মেসোমশাইর সঙ্গে একদিন তাই নিয়ে সে কি ঝগড়া! উনি বললেন জানলায় শিক লাগানো হবে না, আমি বললাম সে কি কথা! ওরা যদি জানলা দিয়ে গলে বাইরে পড়ে যায়?"

মন্দিরা অবাক হয়ে সন্তানহীনা মাসিমার কথা শোনে।

"শিক লাগানো হল, সব হল। এমনি সময় ঘোড়া-গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হল, আমার আর ছেলেমেয়ে হল না—কোনো দিনই আর হল না!"

উঠে পড়ে দেয়ালে ঝোলানো একটা রঙ-ঝলসে-যাওয়া সমুদ্রের ছবির কাছে দাঁড়ালেন। "মিস কারবি বলে একজন মেমসাহেব এই ছবিটা এঁকে তোমার মেসোমশাইকে দিয়েছিলেন। আমার সে কি অশান্তি। রূপসী মেমসাহেবের সঙ্গে আমি পারব কেন? তারপর সে বিলেত চলে গেল, তার কথা সবাই ভুলে গেলাম। ছবিটা কে যে কবে এখানে টাঙিয়েছে তাও মনে নেই, আমি তো ওটাকে চিলে ছাদের ঘরে দূর করে দিয়েছিলাম।"

মন্দিরা বললে, "আমি মাসিমা। চোখে ভালো লাগল তাই নামিয়ে এনেছিলাম। বল তো আবার রেখে আসি।"

মাসিমা ব্যস্ত হয়ে বলেন, "না, না, তোমার ভালো লাগে, এখানেই থাক না, বেশ তো ছবিখানা। তখনই টাঙিয়ে রাখা উচিত ছিল।"

মন্দিরা আর সইতে পারে না। ক্ষিপ্র হাতে জিনিসপত্র যেমন-তেমন করে আলমারিতে বাক্সে তুলে দিতে থাকে। অনিলার বিয়ের গল্প করে, তার শ্বশুরবাড়ির নানান রসের গল্প করে। তার শাশুড়ির কাণ্ড-কারখানার বিস্তারিত বিবরণী দেয়। শুনতে-শুনতে মাসিমার মুখেও আবার হাসি ফোটে।

এর মধ্যে মণিকা-মাসিমাও এসে উপস্থিত হন। কোথায় যেন দুঃস্থা নারীদের জন্য মিটিং করে এসেছেন। এক পেয়ালা চা পর্যন্ত দেয়নি। বলেন, "ওরে মন্দিরা, একটু চা খাওয়া, আর যা হয় একটু খাবার দে, খিদেয়, তেষ্টায় মরে গেলাম।"

ঘরের হাওয়া তৎক্ষণাৎ হাল্কা হয়ে যায়। যেখানে মানুষের খিদে হয়, ইচ্ছে হয়, ক্ষুধা নিবারণ করা যায়, ইচ্ছে মেটানো যায়, সেখানেই কেমন একটা সুখের আভাস থাকে। মন্দিরা লাফিয়ে ওঠে। "আরে তাই তো, মণিকা-মাসিমা। আমারও তো খিদে পেয়ে গেছে। আপিস থেকে ফিরে দেখি, মাসিমা অবেলায় ঘুমোচ্ছেন, তবু এক পেয়ালা চা করে খেলাম, মাসিমা তাও খাননি।"

মাসিমারও উৎসাহ দেখা যায়। "সত্যি তো মনটা তাই কেমন বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। চল, সবাই মিলে একটু চা খাওয়া যাক।"

মন্দিরা চায়ের জল চাপায়, বাসি মালপোয়া বের করে গরম করে, টিন থেকে কুচো নিমকি বের করে গরম করে, গরম-গরম আলু ভাজা করে সবাই মিলে চা খেতে বসে।

"মণিকা-মাসিমা, আপনি বেশ লোক, ঘরে আলো জ্বাললে যেমন হয়, আজ সন্ধ্যেবেলা আপনি এসে ঢুকতেই ঠিক তেমনটি হল।"

মণিকা-মাসিমা খুশিতে ভরপুর হয়ে যান। এমন মিষ্টি কথা বহু-দিন কেউ তাঁকে বলেনি। হেসে মাসিমাকে বলেন, "দেখ হেমনলিনী, মন্দিরার এবার যেমন করে হোক বিয়ে দাও। তারপর তোমাতে-আমাতে একসঙ্গে কালিম্পঙএ আমার ভাইঝির বোর্ডিং হাউসে থাকা যাবে। দুজনেরই শরীর ভালো হবে, দিব্যি ফুলবাগান করা যাবে, শরীরও ভালো থাকবে আর মনও ভালো হবে। আমার পেনসনের টাকাতে আর তোমার বাড়িভাড়ার টাকাতে দিব্যি থাকা যাবে। এই নিচের তলাটাকেও ভাড়া দিয়ে দাও। এখন মন্দিরার একটা বিয়ে না হলে আর কিছুই হবে না।"

মন্দিরাও হেসে বলে, "মন্দিরাকে আবার কে বিয়ে করবে মণিকা-মাসিমা? ত্রিশবছর হতে চলল, বুড়ো বউ কে চায়? বেশ তো আপনারা যান না কালিম্পঙএ, আমিই এই একতলাটার ভাড়াটে হব, মাসিমার ভাড়া-টাড়া আদায় করে দেব, বাড়িঘর দেখাশোনা করব। আপনাদের কালিম্পঙ যাওয়ার জন্য আমাকে বিয়ে করতেই হবে এটা কী রকম ন্যায়-বিচার হল?"

চায়ের পর্ব শেষ হলে, মণিকা-মাসিমা মাসিমাকে ধরে নিয়ে কাদের বাড়িতে যেন বেড়াতে গেলেন। মন্দিরা চায়ের পাট তুলে ফেলে রাতের জন্য হালকা কিছু রাঁধাবাড়ার ব্যবস্থা করে, বসবার ঘরে এসে সেলাই নিয়ে বসে।

ভাবে, ব্রজসুন্দরের কথা একবার মণিকা-মাসিমাকে জিগগেস করলে হত। সে কেমন আছে, তার দিদি ফিরে এসেছেন কিনা, কে জানে। সেদিনকার কথা মনে করে বিষম লজ্জিত বোধ করে। ছি, মন্দিরার মন এত ছোট যে ব্রজসুন্দরের সহজ বক্তব্যটিকে সে গ্রহণ করল না! অমনি ছেলেমানুষের মতো রাগ করে চলে এল। ভাবে, ব্রজসুন্দরের জীবন তো ব্যর্থ হয়নি। সে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয়, দুঃখীর দুঃখ দূর করে। সে যেটাকে ন্যায় বলে গ্রহণ করে, তার থেকে কখনো বিচলিত হয় না, সে লোকের কথাকে গ্রাহ্য করে না। আরে, হাতের কাছে ব্রজসুন্দরের মতো একজন লোক রয়েছে, তবু মন্দিরা পৃথিবীর নিরুদ্দেশ যাত্রা নিয়ে হাহাকার করে কেন?

বইয়ের পাতার মধ্যে থেকে অনিলার লেখা চিঠি বের করে আরেকবার পড়ে। অনিলা তার নতুন-পাতা ঘর-সংসারের কথা লিখেছে। কেমন হাতির দাঁতের মতো রঙের পর্দা, কুসান, কার্পেট কিনেছে, ঐটেই নাকি এখন ফ্যাসান। কেমন বাইরেটা শাদা, ভিতরটা কালো পেয়ালা-পিরিচ কিনেছে। অনিলার বন্ধু মিলির বাড়িতেও নেই। অনিলার আয়া নাকি ইংরিজি ছাড়া কিছু বলে না, অনিলার তাই মহা মুশকিল। কিন্তু শঙ্করের মা আয়ার উপর হাড়ে চটা বলে তাঁর কথায় টপ করে তাকে ছাড়িয়ে দিলে তিনি আবার অযথা আস্কারা পেয়ে যাবেন। দিল্লীতে কেমন পরস্পরের বাড়িতে পার্টি নিয়ে রেষারেষি হয়, তাই অনিলা একটা অ্যামেরিকান পত্রিকা থেকে নানা রকম নতুন সব আইডিয়া আহরণ করে রেখেছে। কেমন কাজে-কর্মে সারাদিন কেটে যায়, গান গাইবারও সময় থাকে না। তবে মাঝে-মাঝে সন্ধ্যাবেলা আপিস থেকে ফিরে শঙ্কর চা খাবার পর, উপরের ছোট ব্যালকনিতে বসে অনিলা তাকে গান শোনায়। তখন অনিলার মনে হয় তার গান শেখা সার্থক হয়েছে। গানের মাস্টার-মশাইয়ের জন্যে শঙ্কর হাতঘড়ি কিনে রেখেছে, রেজেস্ট্রী করে শীঘ্রই পাঠিয়ে দেবে। ইত্যাদি।

মন্দিরার মনে হয় দুনিয়ার কাছে আমরা যেটুকু নিয়ে আসি ঠিক সেইটুকুই পাই। এই নিয়ে আক্ষেপ করার কোনো মানে হয় না। অনিলা খুব সুখী। তার চিঠির শেষ অংশটুকু পড়ে মন্দিরার আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে অনিলা অতিশয় সুখী। কিন্তু মন্দিরার জীবন কেমন করে সার্থক হবে? এত বছর ধরে যেন কিসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল নিজেই তা জানে না। বিয়ে না করলে যে জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় এ কথা মন্দিরা বিশ্বাস করে না। দেশ সুদ্ধ সব মেয়েরা বিয়ে করছে, ছেলেমেয়ে মানুষ করছে, তারা বড় হয়ে কেউ বা মরে যাচ্ছে আবার কেউ বা বিয়ে-থা করে তাদের ছেলেমেয়ে মানুষ করছে। যুগের পর যুগ ধরে তো এই নিয়মে দুনিয়া চলে আসছে, বিয়ে করেছে বলেই যে কারও জীবন সার্থক হয়ে গেছে এমন কথা কে কবে শুনেছে? ছোটবেলায় যত পরীদের গল্প রাজা-রানীদের গল্প পড়েছে সবটাতেই শেষে দুষ্ট লোকেরা সাজা পেল আর ভালো লোকেদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে গেলেই কি আর মানুষের জীবন সার্থক হয়ে যায়? তবে কেন মাসিমার মনে দুঃখ থাকে, মা কেন এত অসুখী? রাত্রের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মন্দিরার মনে হয় কোনো কিছু দিয়েই সুখী হওয়া যায় না, যদি না মনের মধ্যে সুখী হবার ক্ষমতা থাকে। এ সহজ কথাটা কেন এতদিন মন্দিরার মনে হয়নি যে ইচ্ছে করলেই সুখী হওয়া যায়। কিন্তু তাই কি যায়? সংসার ভেঙে যায়, মৃত্যু এসে হানা দেয়, কত যত্নের গোলাপ লতাকে কে যেন নির্মম হাতে উপড়ে ফেলে দেয়। মন্দিরার দুই গাল বেয়ে চোখের জল নামে, ইচ্ছে করলেই যদি সুখী হওয়া যায় তবে কেন দুনিয়ার সব দুঃখ দূর হয়ে যায় না? তাও কি কখনো হয়? ইতিহাসের পাতায়-পাতায় লেখা মানুষের অশ্রুময় কাহিনী কি আর মুছে ফেলা যায়।

মন্দিরা নিজের ব্যর্থ জীবনের দুঃখে কাঁদে, না ব্রহ্মাণ্ডের অশ্রুময় ইতিহাসের জন্য কাঁদে সে নিজেই জানে না।

ব্রজসুন্দর কখন নিঃশব্দে এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে মন্দিরা বুঝতে পারেনি। গম্ভীর স্বরে সে ডাকে, "মন্দিরা!" সে গম্ভীর আহ্বান মন্দিরার কর্ণকুহর ভেদ করে হৃদয়ের সিংহদ্বারে আঘাত করে। মন্দিরা অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে চেয়ে থাকে।

ধীরে-ধীরে পাশে বসে অনভ্যস্ত হাতে রেশমী রুমাল দিয়ে ব্রজসুন্দর মন্দিরার চোখের জল মুছিয়ে দেয়, কিন্তু তখুনি আবার নতুন-নতুন অশ্রুবিন্দুতে মন্দিরার চোখ ভরে ওঠে।

কম্পিত কণ্ঠে ব্রজসুন্দর বলে, "মন্দিরা, তোমাকে দেবার মতো আমার কিছু নেই, নাম, খ্যাতি, মান-সম্মান, রূপ-যৌবন আমার কিছুই নেই। কিন্তু তবুও যদি তুমি আমাকে বিয়ে কর আমার মনে হয় আমি তোমাকে সুখী করতে পারব।"

মন্দিরার ঠোঁট কাঁপে, সহসা কোনো উত্তর দিতে পারে না।

ব্রজসুন্দর আবার বলে, "যা হয় একটা উত্তর তোমাকে দিতেই হবে, মন্দিরা। সত্যের সঙ্গে আর কতদিন লুকোচুরি খেলবে? এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে হয়। আর কত কাল অপেক্ষা করবে?"

খানিক থেমে আরও বলে, "তুমি যা বলবে তাই হবে, মন্দিরা। আমাকে চলে যেতে বল, এখুনি চলে যাব, তোমাকে আর বিরক্ত করব না। আমি জানি তোমার আত্মীয়স্বজনরা আমাকে পছন্দ করেন না, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, কথা হল তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে। আমার নিজের মনকে আমি জানি, আমার মনে হয় আমরা দুজনেই সুখী হতে পারব, অন্তত এ জগতে যতটা সুখী হওয়া সম্ভব। তোমার পুরোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বগুলো যদি দূরে ফেলে দিতে না পারলে মন্দিরা, তবে আর কী পারলে?"

মন্দিরা প্রসন্নমনে নিজের দুই হাত ব্রজসুন্দরের হাতের উপর রেখে বলে, "তবে তাই যেন হয়। এ কথাটা আমিও জানতাম তবে স্বীকার

করবার সাহসও ছিল না, পাত্রও ছিল না।" তারপর একটু হেসে বলে, "তুমি হিন্দুবাড়ির ছেলে বলে আমার আত্মীয়স্বজনরা যদি তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখেন, যদি তেমন আদর না করেন, তোমার কোনো দুঃখ হবে না? অন্য জায়গায় তো বেশি আদর পেতে।"

ব্রজসুন্দরও হেসে বলে, "তোমার কাছ থেকে আদর পেলেই আমার চলে যাবে, মন্দিরা।"

মাসিমা, মণিকা-মাসিমা হঠাৎ ফিরে এসে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকেন।

ব্রজসুন্দর এগিয়ে এসে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "মন্দিরা আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, আপনাদের আশীর্বাদ পাব না আমরা?"

মণিকা-মাসিমা উচ্চকণ্ঠে বলে, "সে কী করে হয়? তোমার দিদি সারাজীবন এত মানামানি করে চলেছেন, তিনি মত দেবেন কেন? আর তোমাদের হালচাল একরকম, এঁদের আরেকরকম, দু'জনে বনবে কেন? বিয়ে একদিন-দুদিনের জিনিস নয়, একটা পার্মানেণ্ট ব্যাপার, ওরকম না ভেবে-চিন্তে মন্দিরাই বা মত দেয় কী করে? এ বিষয়ে গুরুজনদের সঙ্গে কি একটু পরামর্শ করতে হয় না?"

ব্রজসুন্দর একটু মৃদু হাসল। মন্দিরা বললে, "মণিকা-মাসিমা, আপনি তো বিয়েই করেননি, আপনার সঙ্গে আর কী পরামর্শ করা যায়?"

"বিয়ে যারা করে না, তাদের মতামতের মূল্যই তো সব চেয়ে বেশি, কারণ তারা নিরপেক্ষ দর্শক। আচ্ছা আমি না হয় একজন আউটসাইডার, কিন্তু হেমনলিনীর মতটা তো তুমি বেশ জানো। যখন নিরুপায় হয়ে হেমনলিনীর কাছে ছুটে এসেছিলে, সেই তো তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করে তুমি সুখী হবে আশা কর? এ বিয়েতে নিশ্চয়ই তার মত নেই?"

মণিকা-মাসিমা আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, মাসিমা বাধা

দিয়ে বললেন, "না, না, আমার মত আছে। আয় মন্দিরা, এস ব্রজসন্দর, আমি আশীর্বাদ করছি, তোমরা সুখী হবে, আর পাঁচজনকেও সুখী করবে।"

দুজনকে জড়িয়ে ধরে মাসিমা কাঁদতে থাকেন, মন্দিরাও কাঁদতে থাকে, ব্রজসুন্দর অপরাধীর মতো মাসিমার বাহুবেষ্টনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মণিকা-মাসিমার দিকে চেয়ে থাকে।

শেষ পর্যন্ত তিনিও এগিয়ে এসে বলেন, "হেমনলিনীরই যদি মত থাকে, আমি খৃশ্চান মানুষ, আমারই বা কী আপত্তি থাকতে পারে? আমার আশীর্বাদ তোমরা গ্রহণ কর। কিন্তু এর মধ্যে এত কাঁদাকাটির কী হল বুঝলাম না। আমি তো জানতাম লোকের বিয়ে ঠিক হলে একটা আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপার ঘটে।"

অগত্যা মাসিমাও হেসে ফেলেন।

মন্দিরা জিগগেস করে, "তাহলে সত্যি কি তোমরা কালিম্পঙ চলে যাবে মাসিমা, এ বাড়িতে আর থাকবে না?"

মাসিমা যেন ঘুম থেকে উঠে ঘরের চারধারে দৃষ্টিপাত করেন, দেয়ালে ঝোলানো মেসোমশাইয়ের মস্ত ছবির দিকে চেয়ে দেখেন। কত বছর এ-বাড়ি থেকে বেরোননি।

"থাকেব বই কি, এ-বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাব? তবে একবার মণিকার সঙ্গে কালিম্পঙ ঘুরে আসব। আমি তো আশা করে আছি মন্দিরা চলে গেলে, মণিকা আমার কাছে থাকবে। একা থাকতে আমার বড় কষ্ট হয়।"

মণিকা-মাসিমাও কী যেন একটা বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। হেমনলিনী দেবী তাঁকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন, সেই সুযোগে ব্রজসুন্দর উঠে পড়ে বলে, "আমার মনে হচ্ছে, এখন আমার চলে যাওয়া উচিত, এসবের মধ্যে আমার স্থান নেই বরং আমি কাল আসব।"

বিদায় গ্রহণ করতে গিয়ে মণিকা-মাসিমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়—

না, দিদি এখন ভাগলপুরেই থাকবে। মণিমালার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। না, বিশেষ আশ্চর্য হয়নি ব্রজসুন্দর, কারণ পাত্রটির চেহারা কার্তিকের মতো। তাকে একবার দেখেই মণিমালা আর কলেজে পড়বার কথা নাকি উত্থাপন করেনি।

"আজ আসি মাসিমা, আসি মন্দিরা।" ব্রজসুন্দর চলে গেলে মন্দিরা অন্যমনস্কভাবে দরজা জানলা বন্ধ করে দেয়। মণিকা-মাসিমাও কিছুক্ষণ নানান জল্পনা-কল্পনা করে বিদায় নেন। খাওয়া-দাওয়া সারা হয়, মাসিমা মন্দিরাকে চুমো খেয়ে শুতে চলে যান।

মন্দিরাও আলো নিবিয়ে নিজের ঘরে যায়। আয়নার সামনে চুল বাঁধতে-বাঁধতে মনে পড়ে আজ শনিবার। সত্যিই তো, তাহলে শনিবারটা অন্য দিনের মতো নয়! কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে।

চুল বেঁধে শুয়ে-শুয়ে মন্দিরা ভাবে—কী আশ্চর্য, আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই। এই ভালো, এই যে ভালো এ কথা তো আমি জানতাম। কত কথা আছে ব্রজসুন্দরকে বলবার। তাকে বলতে হবে, "আর আমি সুখ-সুখ করে ছুটে বেড়াব না। এই আমার জীবন, এই যা আমি পেলাম, এই দিয়েই আমরা সুখী হব। ভাগ্যিস, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তা নইলে একথা আমি বুঝতাম না।"

॥ সমাপ্ত ॥

বাদামী রঙের শাল গায়ে, বাদামী জুতো পায়ে দিয়ে, সেকেলে পরিবারের ছেলে ব্রজসুন্দর নিমন্ত্রণ রাখতে বেরিয়েছিলেন। ফেরবার পথে বৃষ্টি থেকে কোনো গাড়িবারান্দার নিচে আশ্রয় নিতে গিয়ে এক কাণ্ড হল। পরমাসুন্দরী একা একটি মেয়ে, সোনার কাঁকন-পরা তার ছোট্ট খুকিটিকে ব্রজসুন্দরের কোলে গাছিয়ে দিয়ে হঠাৎ সেই অন্ধকার বৃষ্টির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে বাড়িতে তাঁর অসম্ভব সন্দেহবাতিকগ্রস্ত বিধবা বোন নয়নতারা, মনের মধ্যে সদ্য ট্রামে দেখতে পাওয়া একটি আশ্চর্য মেয়ের স্মৃতি—কালো বুটিতোলা গলাবন্ধ জামার সঙ্গে কালো পাড় শাড়ি তার পরনে, জামার গলায় খুদে একটি কালো ঘুণ্টি লাগানো, আর ঘুণ্টির ঠিক ডান পাশে একটি শিরা ধুকধুক করছে। দেখেই ভালো লেগেছে মেয়েটিকে, এবং ভাগ্যক্রমে মেয়েটির ফেলে যাওয়া 'মন্দিরা' নাম লেখা মানিব্যাগটি এখন তাঁর বুকপকেটে। এই ব্যাগের সূত্র ধরে কী না হতে পারে, ভাবছিলেন ব্রজসুন্দর। কিন্তু, এই পরিত্যক্ত শিশুটিকে নিয়েই বা তিনি কী করেন এখন?

পাকা সংযমী হাতে লেখা মিষ্টি একটি প্রেমের গল্প, যার অধিকাংশ চরিত্রই মেয়েচরিত্র। লীলা মজুমদারের উপন্যাসের জগতই হচ্ছে প্রধানত নারীপ্রধান। সমাজের যে-অংশে শিক্ষিত এবং মোটামুটি বিত্তবান সম্প্রদায়ের বাস, সেই অংশের বিচিত্র নারীচরিত্রকে সকৌতুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। মেয়েদের চোখ দিয়ে মেয়েদের না-দেখলে এমন অন্তরঙ্গ চরিত্রচিত্রণ এবং ঘটনার বিন্যাস সম্ভব হত না। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের মধ্যে 'জোনাকি'র স্থান বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র।